সাহিত্য পাঠ



শ্রীপ্রিয়ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text-Book for Class VII
Vide Notification No. T.B. 76/7/TB/36 dated 24. 12. 76.

সাহিত্য পাঠ

[দ্বিতীয় ভাগ]

শ্রীপ্রিয়ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. বি. টি.
সাহিত্য-বিনোদ, সাহিত্য-সরস্বতী
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, 'এ-জোন' এম. পি. স্কুল,
দুর্গাপুর ষ্টিলপ্লান্ট, দুর্গাপুর, বর্ধমান

প্রান্তিক
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
প্রান্তিক
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৭৪
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৬
পুনর্মুদ্রণ ঃ আগষ্ট, ১৯৮১

দাম ঃ তিন টাকা মাত্র
(... মূল্য নেই)

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুনীলকুমার ভান্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

সাহিত্য পাঠ

[দ্বিতীয় ভাগ]

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

সিলেবাস

সপ্তম শ্রেণী

১। গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ সম্বলিত একটি পাঠ্যগ্রন্থ থাকিবে।

গদ্যাংশের জন্য ৫০ পৃষ্ঠা আর পদ্যাংশের জন্য ৩০ পৃষ্ঠা, মোট ৮০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ হইবে। গদ্যাংশের মধ্যে থাকিবে—

(ক) নানান সাহিত্যিক বিষয়—প্রাকৃতিক দৃশ্য, গল্প, স্মৃতিচারণ, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি।

(খ) স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বিষয়। [দেশীয় কৃষি শিল্প-বাণিজ্যাদি ও জাতীয় গৌরব-বিষয়ক রচনা।]

(গ) জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জীবন-বৃত্তান্ত ও সংগ্রামের কথা [সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুখ্যতঃ ঊনবিংশ শতক হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়ের কথা]।

(ঘ) মহৎ জীবন কথা [সর্বভারতীয় মহাপুরুষদিগের জীবন-বৃত্তান্ত]।

(ঙ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অভিযান।

(চ) একটি নাট্যাংশ।

পদ্যাংশের জন্য প্রসিদ্ধ কবিগণের বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের কবিতা সংকলন করিতে হইবে।

গদ্যাংশে সাধু ও চলিত উভয় রীতির রচনা থাকা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ লেখকবর্গের রচনা সংকলিত হইবে। সংকলকের নিজস্ব রচনাও থাকিতে পারে। বিস্তৃত অনুশীলনী থাকিবে এবং অনুশীলনী ও চিত্রাদির জন্য অতিরিক্ত ৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যোগ করা চলিবে। গ্রন্থের আকার ২২″×৩২″ ($\frac{১}{১৬}$)। টাইপ স্মল পাইকা অথবা পাইকা, ২৪ এম।

সাহিত্য পাঠ

নীতি-মূলক গল্প ঃ



[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়)—জন্ম : ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০ ; মৃত্যু ঃ ২৯শে জুলাই, ১৮৯১। বাংলার সর্বজনপূজ্য মহামনীষী। প্রখ্যাত শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারক। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম সার্থক শিল্পী। আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক। সীতার বনবাস, শকুন্তলা, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা। নিম্নোদ্ধৃত অংশটি 'আখ্যান মঞ্জরী' হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত। মানবিক নীতিপরায়ণতাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।]

পারস্য দেশের কোনও রাজা, যারপরনাই ন্যায়পরায়ণ বলিয়া, সর্বত্র সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে কদাচ অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না ; এবং কাহাকেও অন্যায়াচরণে উদ্যত দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ করিতেন।

একদা, তিনি রাজধানীর অতি দূরবর্তী কোন অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ও অনুসরণে, অবিশ্রান্ত পর্যটন করিয়া, রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইলেন ; এবং স্বীয় অনুযায়ী-দিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া, পরিচারকদিগকে সত্বর আহার প্রস্তুত

করিতে বলিলেন। তদনুসারে তাহারা আহার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দেখিল, রাজধানী হইতে প্রস্থান কালে, রাজার আহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য আনীত হইয়াছে, কেবল লবণ আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে অদূরবর্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিয়া বলিল, যত সত্বর পার, ঐ গ্রাম হইতে লবণ লইয়া আইস। রাজা, পাকশালার সমীপবর্তী পটমণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন; লবণের অভাবে, পাকশালায় যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অবশেষে, প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে যেরূপে লবণ আনিবার নিমিত্ত পাঠাইল, সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি লবণ আনিতে যাইতেছিল, তিনি তাহাকে আপন নিকটে আনাইলেন; এবং বলিলেন, প্রকৃত মূল্য না দিয়া, লবণ আনিলে, আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। অতএব, সাবধান, যেন প্রকৃত মূল্য না দিয়া, কাহারও নিকট হইতে লবণ, অথবা অন্য কোনও দ্রব্য লওয়া না হয়।

এই রাজকীয় আদেশ ও উপদেশ অনুসারে, সে ব্যক্তি প্রধান পরিচারকের নিকটে গিয়া, সবিশেষে সমস্ত বলিয়া, মূল্য প্রার্থনা করিল। পাকশালাস্থ পরিচারকবর্গ, ঈদৃশ অতি সামান্য বিষয়েও রাজার তাদৃশ মনোযোগ দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। প্রধান পরিচারক রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, মহারাজ, মূল্য না দিয়া আপনকার জন্য যৎকিঞ্চিৎ লবণ লইলে, কি কোন দোষ হইতে পারে?

প্রধান পরিচারকের এই বাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজা বলিলেন, দেখ, এক্ষণে পৃথিবীতে সচরাচর যত অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এইরূপে অতি সামান্য বিষয় হইতেই ঐ সমস্তের সূত্রপাত হইয়াছে। আমি রাজা; আমি যদি মূল্য না দিয়া, অল্পমাত্র লবণ লই, ঐ দৃষ্টান্ত অনুসারে রাজপুরুষেরা মূল্য না দিয়া, অধিক মূল্যের বস্তু সকল লইতে আরম্ভ করিবেন। এইরূপে যাহাদের বস্তু লওয়া যাইবে, রাজা অথবা রাজপুরুষেরা লইতেছেন, কিছু বলিলে তাঁহাদের কোপে পতিত হইতে হইবে, এই ভয়ে, কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; কিন্তু মনে মনে গালি দিবে

ও নিন্দা করিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ফলকথা এই, ছল, বল, কৌশল, অথবা অন্যবিধ উপায় অবলম্বন পূর্বক, কাহারও কোন বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা যে যারপরনাই গর্হিত ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর সকল লোকে এই রাজকীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিলে সংসার সর্বাংশে নিরুপদ্রব ও যারপরনাই সুখের স্থান হইয়া উঠে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই।

অনুশীলনী

১। 'রাজকীয় দৃষ্টান্ত' গল্পটি নীতিসহ নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। 'রাজকীয় দৃষ্টান্ত' কোন্ দেশের রাজার ?

৩। রাজা কোথায় মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন ?

৪। পরিচারকগণ কি আনিতে ভুল করিয়াছিল ?

৫। পরিচারকবর্গ কেন বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল ?

৬। যে ব্যক্তি লবণ আনিতে যাইতেছিল, তাহাকে রাজা কি বলিয়াছিলেন ?

৭। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) এক্ষণে পৃথিবীতে......সূত্রপাত হইয়াছে।

(খ) এই ছল, বল......সন্দেহ নাই।

৮। নিম্নোক্ত পদগুলির অর্থ লিখিয়া উহাদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বাক্য রচনা কর ঃ

প্রবৃত্ত, আক্রান্ত, স্বীয়, পটমণ্ডপ, রাজকীয়, ঈদৃশ, তাদৃশ, সবিশেষ।

৯। নিম্নোক্ত শব্দের বানানে কেন মূর্ধন্য 'ণ' ব্যবহৃত হইয়াছে, বল ঃ

পরায়ণ, কিয়ৎক্ষণ, লবণ, অন্বেষণ, অনুসরণ।

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ উদ্যত, অন্বেষণ, তদনুসারে, বিস্ময়াপন্ন।

স্বদেশ-চিন্তা-মূলক প্রবন্ধ ৪



[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—জন্ম ঃ ২৬শে জুন, ১৮৩৮ ; মৃত্যু : ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪। বঙ্গ-ভারতীর বরেণ্য সন্তান। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের পথিকৃৎ—উপন্যাস সাহিত্য-সম্রাট। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সুমহান চিন্তানায়ক। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাস ও বিবিধ প্রবন্ধ, কমলাকান্তের দপ্তর, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা। উদ্ধৃত অংশ 'বিবিধ প্রবন্ধ' হইতে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত। উহাতে বাঙ্গালীর সুতীব্র জাতীয় চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।]

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল-অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল-অসার গৌরব-শূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না,—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরব-শূন্য ? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার ; চৈতন্যের ধর্ম ; রঘুনাথ, গদাধর জগদীশের ন্যায় ; জয়দেব বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল ? দুর্বল, অসার,

গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্বল, অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপে অবিনশ্বর কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধহয় নাকি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?

সেই সার কথা কোথা পাইব? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই।

সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিন্হাজউদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা। আর মিন্হাজউদ্দীন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লানবদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু সে সাতশত বৎসর মরিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এইমাত্র কারণ এই যে, সাহেবরা সেই মিন্হাজউদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরি হয়! বিশ্বাস করিবে না কেন?

তুমি বলিবে যে তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমত? যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরিপ্রিয়! তুমি কেন একথায় বিশ্বাস কর?

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্তিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ

আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশীর যুদ্ধে জন দুইচারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ-তামাসা হইয়াছিল।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী, অসার পরপীড়কদিগের জীবনরচিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? —তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?

অনুশীলনী

১। "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই।"—লেখক কেন ঐ কথা বলিয়াছেন?

২। ইতিহাস না থাকিলে বাঙ্গালীর কি ক্ষতি হইবে?

৩। "বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই রূপ সর্বত্র"—কি রূপ?

৪। মিন্‌হাজউদ্দীনের রচনা সম্পর্কে লেখকের মতামত কি?

৫। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে লেখকের মূল বক্তব্যটি কি?

৬। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর:

(ক) 'চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।' (খ) 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বত্র।' (গ) 'মা যদি মরিয়া যান……আনন্দ নাই?'

৭। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: দুর্বল, রাজ্যাধিকার, অশ্বারোহী, অর্ধেক, কুলাঙ্গার।

জলপথে অভিযান-কাহিনী ঃ



[অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়—জন্ম ১লা মার্চ, ১৮৬১ ; মৃত্যু ঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০। বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচয়িতা। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ফিরিঙ্গি বণিক্ প্রভৃতি পুস্তক রচয়িতা। নিম্নোদ্ধৃত অংশটি 'ফিরিঙ্গি বণিক্' হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত। জলপথে ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কারে ইউরোপীয় বণিক্গণের অভিযান-কাহিনী এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।]

সেকালে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অত্যল্প অংশই খ্রীষ্টান সমাজের নিকট সুপরিচিত ছিল। তাহারা জানিত,—জিব্রাল্টারের দক্ষিণে ৮ ডিগ্রি পর্যন্ত গমনাগমন করা যায়। তাহার দক্ষিণে "বোজাডর অন্তরীপ"। সেই সীমাই শেষ সীমা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হেনরীর (পর্তুগাল রাজকুমার) সুশিক্ষিত নাবিকগণ বোজাডর অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে খ্রীষ্টান সমাজের ভ্রান্ত-সংস্কার দূরীভূত হইয়া গেল। বিষুবরেখার নিকটবর্তী হইলে যে ভস্মসাৎ হইবার আশঙ্কা নাই, সে কথা জনসমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিলেই যে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হইবে, তাহাতে কাহারও সংশয় রহিল না।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বারথোলেমুডায়া নামক নাবিকবর দক্ষিণ সমুদ্রপথে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মিশর পথে অনুসন্ধান কার্যে প্রবৃত্ত হইবার

জন্য কোভিলহাম্ এবং পয়ভা নামক দুইজন স্থল পর্যটকও বহির্গত হইয়াছিলেন। ডায়া যখন দক্ষিণ সাগরপথে পোত চালনা করেন, এই দুই স্থল পর্যটক তখন লোহিত সাগরতীরে এডেন বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। কোভিলহাম্ তথা হইতে আরবীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ভারত যাত্রা করিলেন।

কোভিলহাম্ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের বিবিধ বন্দর পরিদর্শন করিয়া তথা হইতে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সোফালা বন্দরে উপনীত হইলেন। সোফালা হইতে মাদাগাস্কার দ্বীপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার সুপরিচিত সমুদ্রপথ এইরূপে কোভিলহামের প্রত্যক্ষ গোচর হয়। তিনি সমস্ত সমাচার লিপিবদ্ধ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিলেন এবং আবিসিনিয়া গমন করিবার জন্য পুনরায় পূর্বাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কোভিলহামের ভ্রমণ-কাহিনী ইউরোপে উপনীত হইবার পূর্বেই নাবিকবর ডায়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি অকুতোভয়ে দক্ষিণাভিমুখে পোত চালনা করিতে করিতে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমাসংলগ্ন সমুদ্রপথে উপনীত হইয়া প্রবল ঝটিকায় বিপর্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অর্ণবপোত সে ঝটিকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। অজ্ঞাত সমুদ্রপথে এতদূর অগ্রসর হইয়া, নাবিকগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অগত্যা ভারতবর্ষে উপনীত হইবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ডায়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই শনিবার ইউরোপের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন টেগস্ নদীর তীরভূমি অপূর্ব শোভায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। স্বদেশের পবিত্র তটতল চুম্বন করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা ১৬০ জন নাবিক লইয়া ভারত-যাত্রায় বর্হিগত হইলেন।

ভাস্কো-ডা-গামা যাহাদের সহিত সমুদ্র-যাত্রা করেন, তাহারা নাবিক, সৈনিক, কর্মচারী, বণিক্,—একাধারে সর্বময়। তাঁহারা যখন আফ্রিকার পশ্চিম তটের শেষ সীমায় আসিয়া "উত্তমাশা অন্তরীপ" অতিক্রম করিলেন, সেদিন নিশান উড়াইয়া, জয়ধ্বনি করিয়া, রণবাদ্যরবে বিজয় ঘোষণা করিলেন।

২৬শে এপ্রিল তারিখে গামা আফ্রিকার পোতাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া

ভারতবর্ষাভিমুখে পোত চালনা করিলেন। আফ্রিকা হইতে যে পথ প্রদর্শক (আড়কাঠি) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার ইঙ্গিত ক্রমেই পোত সকল পূর্বাভিমুখে পরিচালিত হইতে লাগিল। ভাস্কো-ডা-গামা এই উপায় প্রাপ্ত না হইলে, কালিকটের প্রসিদ্ধ বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। ২৩ দিবস পোত চালনা করিবার পর ভাস্কো-ডা-গামা পূর্ব গগনে এক অপূর্ব মেঘমালা দর্শন করিলেন ; আড়কাঠি কহিল,—যাহা মেঘমালা রূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহাই ঘাটগিরির শিখরমালা।

১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে গামার বাণিজ্যপোত কালিকটের সম্মুখে ভারত-ভূমির "তালীবনরাজিনীলা" সমুদ্র বেলায় উপনীত হইল। ফিরিঙ্গি বণিকের ভারত-যাত্রা সফল হইল। প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সহিত প্রতীচ্য সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ পরিচয় সাধিত হইল। সমগ্র প্রাচ্য রাজ্যের ইতিহাস অভিনব ঘটনাস্রোতে বিপর্যস্ত হইবার সূত্রপাত হইল।

অনুশীলনী

১। বারথোলেমুডায়ার অভিযান কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২। কোভিলহাম্ কে? তাহার ভ্রমণের ফলে পর্তুগালবাসী কেন উল্লসিত হইল?
৩। বারথোলেমুডায়ার কে ছিলেন?
৪। কত খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ সমুদ্রপথে প্রেরিত হইয়াছিলেন?
৫। —খ্রীষ্টাব্দের—জুলাই— ইউরোপের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। উপরের শূন্যস্থান পূর্ণ কর।
৬। ভাস্কো-ডা-গামার ভারত-অভিযান কাহিনীর বর্ণনা দাও।
৭। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর: (ক) 'ভারতভূমির তালীবনরাজিনীলা...... হইল।' (খ) 'সমগ্র প্রাচ্য......সূত্রপাত হইল।'
৮। টীকা লিখ: রাজকুমার হেনরী, বিষুবরেখা, লোহিতসাগর, আড়কাঠি।
৯। সন্ধিবিচ্ছেদ কর: আবিষ্কার, পবিত্র, বহির্গত, জলাঞ্জলি।

স্মৃতিচারণ-মূলক কাহিনী ঃ



[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জন্ম ঃ ৭ই মে, ১৮৬১ ; মৃত্যু ঃ ৭ই আগষ্ট, ১৯৪১। আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপুরুষ ও সর্বযুগের, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার আলোকে সমুজ্জল। তিনি অসংখ্য কাব্য, সঙ্গীত, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, ছড়া, নাটিকা, কথিকা, প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। উদ্ধৃত অংশটি তাঁহার আত্মজীবনী-মূলক রচনা 'ছেলেবেলা' হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত হইয়াছে। সেকালের বাঙ্গালী জীবনের স্মৃতিচিত্রই এখানে চিত্রিত হইয়াছে।]

আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী-ঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহি গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এইরকম একটি শখের দলের দলপতি। পালা রচনা করার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘর-পোষা এই যেমন শখের যাত্রা, তেমনি ব্যবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারী নেশা। এ পাড়ায়, ও পাড়ায়, এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো কিংবা লেখা-পড়ায় এমন-কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায়। আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার যোগাড়-যন্তর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারদিকে উঠেছে তামাকের ধোঁয়া। ছেলেগুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া ; অল্প বয়সে তাদের

মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙ-করা টিনের বাক্সোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল্‌পিল্ করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চারদিকে টগ্‌বগ্ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়। রাত্রি হবে নটা; পায়রার পিঠের উপর বাজপাখির মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম, কড়াপড়া শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধরে বলে, 'মা ডাকছে, চলো, শোবে চলো।'

সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম। কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল; হুকুম বেরোল ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নল-দময়ন্তীর পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে। বার বার ভরসা দেওয়া হল, সময় হলেই আমাদের জাগিয়ে দেবে। উপরওয়ালাদের দস্তর জানি, কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। কেননা, তাঁরা বড়ো, আমরা ছোটো।

সে রাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা কারণ, মা বললেন, তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন। আর একটা কারণ, ন'টার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে বেশ একটু ঠেলাঠেলির দরকার হত। এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হল বাইরে। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। একতলায় দোতলায় রঙিন ঝাড়-লণ্ঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চারদিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা চোখে ঠেকছে মস্ত। একদিকে বসে আছেন বাড়ির কর্তারা আর যাঁদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকি জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে। থিয়েটারে এসেছিলেন পেটে সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্দর লোকেরা যাদের বলে 'বাজেলোক'। তেমনি আবার পালা-গানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া-কলমে, যারা ইংরেজি কপি-বুকের মক্‌শো করেনি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পণ্ডিত মশায় দেননি পালিশ করে।

সভায় যখন দাদাদের কাছে এসে বসলুম, রুমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে

আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল খোশনাম।

রাত ফুরোতো, যাত্রা ফুরোতে চাইত না। মাঝখানে নেতিয়ে পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারিনি। জানতে পারলে সে কি কম লজ্জা—যে মানুষ বড়োদের সমান সারে বসে বকশিশ দিচ্ছে ছুঁড়ে, উঠোন সুদ্ধ লোকের সামনে তাকে কিনা এমন অপমান! ঘুম যখন ভাঙল দেখি মায়ের তক্তাপোশে শুয়ে আছি। বেলা হয়েছে বিস্তর, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। সূর্য উঠে গেছে অথচ আমি উঠিনি, এ ঘটেনি আর-কোনো দিন।

শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো। মাঝে মাঝে তার ফাঁক নেই। রোজই যেখানে-সেখানে যখন-তখন সিনেমা, যে খুশি ঢুকে পড়ছে সামান্য খরচে। সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ দু' কোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।

আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুত্তুর। মাঝে মাঝে পালপার্বণে যখন মর্জি হত আপন এলেকায় করত দান-খয়রাত। এখনকার কাল সদাগরের পুত্তুর, হরেক রকমের ঝকঝকে মাল সাজিয়ে বসেছে সদর রাস্তার চৌমাথায় —বড়ো রাস্তা থেকে খদ্দের আসে ; ছোটো রাস্তা থেকেও।

অনুশীলনী

১। 'সে রাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম'—কোন্ রাত্রে ? সে রাত্রে আর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

২। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : (ক) 'সব-তাতে মানা করাটাই বড়দের ধর্ম।'
(খ) 'আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুত্তুর।'

৩। 'সব-তাতে মানা করাটাই বড়দের ধর্ম'—উক্তিটি কতদূর সত্য ?

৪। 'রাত ফুরোত, যাত্রা ফুরোতে চাইতো না'—উক্তিটির প্রসঙ্গ উল্লেখ কর।

স্বদেশচিন্তা-মূলক বীরবাণী :



[স্বামী বিবেকানন্দ—(নরেন্দ্রনাথ দত্ত)। জন্ম : ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ ; মৃত্যু : ২রা জুলাই, ১৯০২। বীরব্রতী হিন্দুধর্ম প্রচারক ও সন্ন্যাসী। তিনি ওজস্বীভাষা ব্যবহার দ্বারা বাংলা গদ্য সাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেন। 'জ্ঞানযোগ', 'রাজযোগ', 'পরিব্রাজক', 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। উদ্ধৃত অংশটি 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ হইতে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত। নিম্নবর্ণগণই যে ভারতের ভবিষ্যৎ—ইহাই উহাতে বলা হইয়াছে।]

আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর ; আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলেই ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি !! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা-কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি ! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা ! তোমরা ভূতকাল। বর্তমানকালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতা জনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, স্বপ্ন-রাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি ক'রছ কেন ? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না ? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত

কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্য—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভূনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে ; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না ; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম !! অতীতের কঙ্কালচয় ! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্ন পেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও।

অনুশীলনী

১। ভারতের উচ্চবর্ণের প্রতি স্বামীজী কি উপদেশ দিয়াছেন ?

২। ভবিষ্য-ভারত বলিতে স্বামীজী কাহাদের কথা বলিয়াছেন ? তাহাদের প্রতি স্বামীজীর মমত্বের কারণ কি ?

৩। "ভারতে যা-কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে" —কাহাদিগকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ?

৪। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) যাদের চলমান শ্মশান······তাদেরই মধ্যে।

(খ) এ মায়ার সংসারের······দুঃস্বপ্ন।

৫। অর্থ লিখিয়া বাক্য রচনা কর ঃ ডম্ফ, চিত্রশালিকা, পূতিগন্ধ, রত্নপেটিকা।

জাতীয়ভাবাদী নাট্যাংশ :



[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়— জন্ম : ১৯শে জুলাই, ১৮৬৩ ; মৃত্যু ১৭ই মে, ১৯১৩। রসরচনায় সিদ্ধকবি ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার। সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, মেবারপতন, রাণা প্রতাপসিংহ, পরপারে, বঙ্গনারী প্রভৃতি নাটক রচয়িতা। উদ্ধৃত অংশটি জাতীয়তাবাদী নাটক 'রাণা প্রতাপসিংহ' হইতে সংক্ষিপ্তকারে গৃহীত।]

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত জঙ্গল। কাল—সন্ধ্যা।

[প্রতাপসিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সম্মুখে কবিরাজ, রাজপুত সর্দারগণ, পৃথ্বীরাজ ও অমরসিংহ]

প্রতাপ—পৃথ্বীরাজ ! এও সহিতে হোল ! সম্রাটের কৃপা !

পৃথ্বীরাজ—কৃপা নয়, প্রতাপ !—ভক্তি।

প্রতাপ—পৃথ্বী, অপলাপ করছ কেন ? ভক্তি নয়, কৃপা ! আমি হতভাগ্য, আমি দুর্বল, পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট তাই আমাকে আর আক্রমণ কর্বেন না। শেষে মরবার আগে এও সহিতে হোল ! উঃ !—গোবিন্দসিংহ !

গোবিন্দ—রাণা।

প্রতাপ—আমাকে এই শিবিরের বাহিরে একবার নিয়ে চল। মরবার আগে আমার চিতোরের দুর্গ একবার দেখে নিই।

[গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। কবিরাজ কহিলেন] "ক্ষতি কি।"

[সকলে মিলিয়া প্রতাপসিংহের পর্যঙ্ক বহিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন]

"বাঁচবার কোন আশা নাই?"

কবিরাজ—কোন আশা নাই।

[গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন। প্রতাপ শয্যায় অর্ধোত্থিত হইয়া অদূরে চিতোর দুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিলেন—]

"ঐ সেই চিতোর! ঐ সেই দুর্জয় দুর্গ যা একদিন রাজপুতের ছিল; আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়ছে।—ঐ সেই চিতোর! তা উদ্ধার কর্ব ভেবেছিলাম! কিন্তু পার্লাম না। কার্য প্রায় সমাধা ক'রে এনেছিলাম; কিন্তু তার পূর্বেই দিবা অবসান হোল! কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।"

পৃথ্বীরাজ—তার জন্য চিন্তা নাই প্রতাপ, সকল সময়ে কাজ একজনের দ্বারা সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়; কখনও বা পিছিয়েও যায়। কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে, যে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে আগিয়ে নিয়ে যায়। জন্ম ও মৃত্যুতে মানুষের উত্থান! সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ!—কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ—চিন্তা থাক্‌ত না, যদি বীরপুত্র রেখে যেতে পার্তাম। কিন্তু—ওঃ—

[এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন]

গোবিন্দ—রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে?

প্রতাপ—হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয় গোবিন্দসিংহ! যন্ত্রণা মানসিক।—আমার মনে হচ্ছে যে আমার মৃত্যুর পরে এ কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ—কেন রাণা?

প্রতাপ—আমার মনে হচ্ছে যে আমার পুত্র অমরসিংহ সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ—সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা।

প্রতাপ—কারণ আছে, গোবিন্দসিংহ। অমর বিলাসী ; এ দারিদ্র্যের বিষ সহ্য কর্তে পার্বে না। তাই ভয় হয় যে, আমি মরে গেলে এ কুটির স্থলে প্রাসাদ নির্মিত হবে, আর মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। আর তোমরাও সে বিলাস-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেবে!

গোবিন্দ—বাপ্পার নামে অঙ্গীকার কর্চ্ছি—তা কখনো হবে না।

প্রতাপ—তবে এখন আমি কতক সুখে মরতে পারি। [পরে অমরসিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন]—অমরসিংহ, কাছে এস,—আমি যাচ্ছি। শোন। যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়! কেঁদ না বৎস! আমি তোমাকে একা রেখে যাচ্ছি না।—আমি তোমাকে সমস্ত মেবার রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পার্লাম না, এই দুঃখ রৈল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্বাদ—যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার কর্তে পারো। আর দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি [অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন] যার সম্মান, আশা করি তুমি উজ্জ্বল রাখবে। আর কি বলব পুত্র! যাও, জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও।—এই আমার আশীর্বাদ।

[অমরসিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রতাপ কহিলেন]

"জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে। অমরসিংহ!—কোথায় তুমি। এস, আরো কাছে এস। তবে—যাই—যাই—"

[কবিরাজ নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন]

"রাণার মানবলীলা শেষ হয়েছে। সৎকারের আয়োজন করুন।"

গোবিন্দ—পুরুষোত্তম! মেবারের সূর্য!—প্রিয়তম! তোমার চিরসঙ্গীকে ফেলে কোথায় গেলে!

[বলিতে বলিতে মৃত রাণার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। রাজপুত সর্দারগণ নতজানু হইয়া মৃত রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল।]

পৃথ্বীরাজ—যাও বীর! তোমার পুণ্যার্জিত স্বর্গধামে যাও। তোমার কীর্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল হৃদয়ে, মানবজাতির হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকবে।

—যবনিকা পতন—

অনুশীলনী

১। অন্তিম শয্যায় প্রতাপ নাট্যাংশে তোমার প্রিয় চরিত্রটি বর্ণনা কর।

২। কোন্ অসমাপ্ত কর্মের জন্য প্রতাপ আক্ষেপ করেন? কে তাহাকে কি কথায় সান্ত্বনা দেন?

৩। "বাঁচবার কোনও আশা নাই" কাহার বাঁচবার আশার কথা বলা হইয়াছে? বাঁচলেন কি?

৪। 'তোমার কীর্তি……মানবজাতির হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকবে।' কাহার কীর্তির কথা বলা হইয়াছে?

৫। 'কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল'—কি কাজ ও কেনই বা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল?

৬। সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা। কিসের ভয় এবং কেনই বা, তাহার কারণ ছিল না।

৭। প্রতাপ পুত্রকে কি উপদেশ দেন ও কি উপহার দেন?

৮। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর: (ক) 'কার্য প্রায় ·····অবসান হোল।'
(খ) 'জন্ম ও মৃত্যুতে···ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ।'

[জ্ঞাতব্য: নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল টডের 'রাজস্থান' হইতে প্রতাপ সিংহ নাটকের আখ্যায়িকা গ্রহণ করেন ও নাটকটি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই নাটকে চিতোর উদ্ধারের সঙ্কল্প হইতে রাণার মৃত্যু অবধি প্রায় পঁচিশ বৎসরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রতাপ সিংহ ঐতিহাসিক পুরুষ। তিনি ছিলেন মেবারের মহারাণা ও উদয় সিংহের পুত্র। ১৫৭৭—১৫৮০ পর্যন্ত বার বার মোগল সম্রাট আকবরের সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহার পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার করিলেও চিতোর উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় স্বদেশপ্রাণ মহাবীর জগতের ইতিহাসে বিরল।]

ঐতিহাসিক গল্পকাহিনী :



[অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জন্ম : ৭ই আগষ্ট, ১৮৭১ ; মৃত্যু : ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও কথা-সাহিত্যিক। শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনীর রচয়িতা। উদ্ধৃত অংশটি 'রাজকাহিনী' হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত। পুণ্যবতী ও ভক্তিমতী রমণী মীরাবাঈ-এর অমর জীবন-কাহিনীর এক অধ্যায় এখানে বর্ণিত হইয়াছে।]

রাণাকুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর রাণী মীরা দেখতে যেমন, গান-গাইতেও তেমনি। রতিয়া-রাণার মেয়ে মীরা। তাঁর গান শুনে, রূপ দেখে রাণাকুম্ভ তাঁকে বিয়ে করেন। রাণী স্বামীর সেবা করেন কিন্তু মন তাঁর পড়ে থাকে রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরে—বাঁশী হাতে কালোপাথরের দেবমূর্তির পায়ের কাছে।

রাণার কিন্তু এসব ভালোলাগে না। তিনি নিজে কবি, গান রচনা করেন, আর সেই গান মীরা গায় রাজমন্দিরে বসে—এই চান রাণা। কিন্তু সেতো হলো না! মীরা দেবতার দাসী, তিনি রণ্‌ছোড়ীর মন্দিরেই সারাদিনমান ভক্তদের মধ্যে গাইতে লাগলেন, "মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!"

চিতোরেশ্বরী মীরা সবার মাঝে গান গাইবে একতারা বাজিয়ে, এটা ভারি লজ্জার কথা হয়ে উঠলো। রাণা হুকুম দিলেন, "মন্দিরে বাইরের লোক আসা

বন্ধ কর।”—এক রাতের মধ্যে মন্দিরটা কানাতে ঘেরা হয়ে গেল। মীরাকে আর কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু গানের সুর শুনতে কানাতের বাইরে দেশ-বিদেশের লোক জড়ো হয়। বাঁশি শুনে হরিণ যেমন, তেমনি সবাই একমনে কান পেতে প্রাণভরে মীরার গান শুনতে থাকে—তাড়ালে যায় না, হুকুম শোনে, কাউকে মানেও না।

জোছ্‌না-রাতে মন্দিরের সামনে শ্বেতপাথরের বেদীতে বসে সোনা আর হীরে-জড়ানো সাজে সেজে মীরা স্বর্গের অপ্সরীর মতো দেবতার সামনে একলা নাচছেন, গাইছেন, রাণা বীণা বাজাচ্ছেন, বাইরে লোকের ভিড়, এমন সময় আকাশ থেকে তারার মালার মতো একগাছি হীরের হার মীরার গলায় এসে পড়ল। রাণা চমকে উঠে বীণা বন্ধ করলেন। মীরা সেই অমূল্য হার নিজের গলা থেকে খুলে মন্দিরের মধ্যে বংশীধারী রণ্‌ছোড়জীর গলায় পরিয়ে দিয়ে সে রাতের মতো গান বন্ধ করলেন। হার যে কে দিয়ে গেল, তাঁর খোঁজ হলো না, কিন্তু দেশে নানা কথা রটলো। কেউ বললে, দিল্লীর বাদশা দিয়ে গেছেন; কেউ বললে, কে এক উদাসীন, কেউ বা আরো কতকি। কিন্তু মীরা অমূল্য হার রাণাকে না দিয়ে যে রণ্‌ছোড়জীকে নিবেদন করে দিয়েছেন, তাতে সবাই খুশি হল। ভক্তেরা মীরার জয়জয়কার দিলে! কিন্তু রাণা কুম্ভ একটু চটলেন। তিনি হুকুম দিলেন, “এবার ভক্তরা আসুন মন্দিরে আর মীরা থাকুন বন্ধ অন্দরে।” এই হুকুম দিয়ে রাণা মহম্মদ খিলজীর সঙ্গে লড়ায়ে চলে গেলেন। মীরার গান বন্ধ হলো। সেই সঙ্গে চিতোর নিরানন্দ হয়ে গেল। মন্দিরে কাঁদে ভক্তেরা; অন্দরে কাঁদেন মীরা। নন্দলালার দেখা না-পেয়ে বন থেকে ছিঁড়ে আনা ফুলের মতো মীরা দিন দিন মলিন হচ্ছেন, এমন সময় একদিন যুদ্ধ জয় করে ধুমধামে মহারাণা চিতোরে এলেন। মামুদ শা-কে রাণা তার মুকুটের সঙ্গে চিতোরে বন্ধ রাখলেন। রাজ্যের কারিগর মিলে পাথর কেটে চিতোরের মাঝখানে প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ তুলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু মীরার মন রাণা জয় করতে পারলেন না, মীরা বললেন, “রাণা, আমি নন্দলালার দাসী, আমাকে ঘরে বন্ধ কোরো না। আমি শুনতে পাচ্ছি আমার নন্দলালা বাইরে থেকে আমাকে ডাকছেন—‘মীরা, আয়!’

আমাকে ছেড়ে দাও রাণা, আমি পথের কাঙালিনী হয়ে নন্দলালার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলে যাই!" রাণা রেগে বললেন, "রতিয়া সামান্য সর্দার, তার মেয়ে তুমি! তোমার কপালে সিংহাসন জুটবে কেন? যাও বেরিয়ে যেখানে খুশি—আমি নতুন রানী নিয়ে আসছি।" সেইদিন থেকে চিতোরেশ্বরীর মীরা, নন্দলালার মীরা, ভিখারিণীর মতো একতারা বাজিয়ে পথে বার হলেন।

অনুশীলনী

১। রাণা কুম্ভ কে? মীরা কে? রাণা কুম্ভ কেন মীরাকে বিবাহ করেন?

২। 'চিতোরেশ্বরী মীরা' কিভাবে 'নন্দলালার মীরা' হইয়া উঠিলেন?

৩। মীরার মন পরিবর্তনের জন্য রাণা কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন?

৪। 'কিন্তু সে তো হোল না!'—কি হোল না?

৫। 'মীরার গান বন্ধ হ'লো'—কি ক'রে?

৬। 'রাণা চমকে উঠে বীণা বন্ধ করলেন'—কি কারণে রাণা বীণা বন্ধ করিলেন? ঐ ঘটনার ফল কি হইয়াছিল?

৭। মীরার সহিত রাণার কথোপকথন সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৮। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর:

(ক) 'মীরা কহে·········নন্দলালা।'

(খ) 'বাঁশী শুনে·········মানেও না।'

(গ) 'আমি নন্দলালার দাসী·········কোরো না।'

৯। '—আমি নতুন রানী নিয়ে আসছি।' উক্তিটি কাহার এবং কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে এই উক্তিটি করা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা কর।

১০। টীকা লিখ: চিতোর, রণছোড়জী, বৃন্দাবন।

[জ্ঞাতব্য: মীরাবাঈ—ধর্মপ্রাণা মহীয়সী রমণী মীরাবাঈ পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রাঠোর বংশোদ্ভব রাজপুত রমণী। বাল্যকাল হইতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যের জন্য মেবারের রাণা কুম্ভ তাঁহাকে বিবাহ করেন। রাজপরিবার শক্তি উপাসক হইবার জন্য শেষ অবধি মীরাবাঈ অতুল জাগতিক ভোগ ঐশ্বর্যকে পিছনে ফেলিয়া হরিনাম গান করিতে করিতে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন। দ্বারকাতীর্থে তাঁহার মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁহার গীত ও ভজন গানগুলি ভক্তজনের আদরের সামগ্রী।]

পারিবারিক গল্প ঃ



[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—জন্ম ঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ ; মৃত্যু ঃ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮। কথাসাহিত্য সম্রাট। প্রসিদ্ধ মরমী কথাশিল্পী। গ্রামীণ বাংলার জীবন ও সমাজের নিঁখুত চিত্র আন্তরিক সততার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। কাশীনাথ, দত্তা, দেবদাস, বড়দিদি, রামের সুমতি, পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, বিপ্রদাস, পথের দাবী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। উদ্ধৃত অংশটি 'রামের সুমতি' হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত। উহাতে বাঙ্গালীর পারিবারিক গ্রামীণ জীবনের স্নেহ-মধুর চিত্র ও এক সরল গ্রাম্য বালকের কাহিনী রূপলাভ করিয়াছে।]

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোক তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না। তাহার বৈমাত্রেয় বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারীতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমি-জমা তদারক করিত। তাহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন—সে আজ তের বৎসরের কথা—সে বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বছরের শিশু রাম এবং এই মস্ত সংসারটা তের বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এই বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা-পাশ করা ডাক্তার নীলমণি সরকারের একটাকা ভিজিট দুই টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাঁহার কুইনিনের পুরিয়া, আরারুট ময়দা-সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ীর দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে ভিন্ গাঁয়ে যেতে হবে—সেখানে চারটাকা ভিজিট—আসতে পারবেন না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও নাহয় চার টাকাই দেবো, টাকা আগে না প্রাণ আগে? যা তুই চামারটাকে ডেকে আন্‌গে।

রামলাল উঠানের একধারে পিয়ারা তলায় বসিয়া পাখীর খাঁচা তৈরি করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, তুই থাক নেত্য, আমি যাচ্ছি।

দেবরটির সাড়া পাইয়া উদ্বেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওগো, রামকে মানা কর। ও রাম, মাথা খাস্ আমার, যাস্‌নে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা, ঝগড়া করতে নেই।

রাম কর্ণপাতও করিল না—বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও কাঠিগুলা ধরিয়া বসিয়াছিল, কহিল, খাঁচা বুনবে না কাকা?

বুনবো অখন, বলিয়া রাম চলিয়া গেল।

নারায়ণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেন তুমি ওকে যেতে দিলে? দেখ, কি কাণ্ড বা করে আসে।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, রাগিয়া বলিলেন, আমি কি করব? তোমার মানা শুনলে না, আমার মানা শুনবে?

হাত ধরলে না কেন? ও হতভাগার জন্যে আমার একদণ্ডও যদি বাঁচতে ইচ্ছে করে। নেত্য, লক্ষ্মী মা আমার, দাঁড়িয়ে থাকিস নে—ভোলাকে পাঠিয়ে দেগে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনুক—সে হয়ত এখনও গরু নিয়ে মাঠে যায়নি। নেত্যকালী ভোলার সন্ধানে গেল।

রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন

ডিস্‌পেন্‌সারিতে অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা আলমারির সামনে একটা ভাঙ্গা টেবিলে ধরিয়া নিক্তি-হাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চারি-পাঁচ জন রোগী হাঁ-করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়-চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন? ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আমি কি করব—ওষুধ দিচ্ছি —ছাই দিচ্ছ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভাল হয়!

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন নিক্তি সব ভুলিয়া চোখ রাঙ্গা করিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া চহিয়া রহিলেন। এত বড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্ধা যে সংসারের কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুঁড়ো তবে নিতে আসিস কেনরে? তোর দাদা পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায় কেনরে?

রাম বলিল, এদিকে ডাক্তার নেই, তাই ডাকতে পাঠায়। থাকলে পাঠাতো না।

লোকগুলো স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্বার বলিল, তুমি ছোট জাত, বামুনের মান-মর্যাদা জান না, তাই বলে ফেললে, পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায়। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সত্যই ভেঙে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোনো, ভালো ওষুধ নিয়ে এখনি এসো, দেরি ক'রোনা, আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আমবাগান করেছ, বেশি বড় হয়নি তো—কুড়ুলের এক এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে শিশি বোতল গুঁড়ো করে দিয়ে যাব।—বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

* * * * *

নারায়ণী বাহিরের দিকের জানালায় চোখ রাখিয়া ছটফট করিতেছিলেন। রাম বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, গোবিন্দ, খাঁচা ধরবি আয়।

নারায়ণী ডাকিলেন, ও রাম, এ-দিকে আয়।

রাম কঞ্চির মধ্যে সাবধানে কাঠি পরাইতে পরাইতে বলিল, এখন না, কাজ কচ্চি।

নারায়ণী ধমক দিয়া বলিলেন, আয় বলছি শীগ্‌গির!

রাম কাঠিগুলো নামাইয়া রাখিয়া বৌদির ঘরে গিয়া তক্তাপোসের একধারে পায়ের কাছে গিয়া বসিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারের সঙ্গে তোর দেখা হ'লো?

হ্যাঁ।

কি বললি তাঁকে।

আসতে বললুম।

নারায়ণী বিশ্বাস করিলেন না—শুধু আসতে বল্‌লি—আর কিছু বলিস নি?

রাম চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, বল্ না কি বলেচিস্ তাঁকে?

বলব না।

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল—ডাক্তারবাবু আসছেন।

নারায়ণী মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন করিয়া নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৌমা, জ্বর সারা না-সারা কি ডাক্তারের হাতে? তোমার দেওরটি আমাকে দু'টি দিনের সময় দিয়েছে। এর মধ্যে সারে ভাল, না সারে তো আমার ঘরে-দোরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ওর ঐ-রকম কথা, আপনি কোন ভয় করবেন না।

ডাক্তার বলিলেন, লোকে বলে ওর একটা দল আছে। তাদের যে কথা সেই কাজ। তাতেই বড় শঙ্কা হয় মা! আমরা ওষুধ দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারিনে।

নারায়ণী বলিলেন, ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে, তা জানি; কিন্তু ওই সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয় তাই ভাবি।

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনিন এবং টাটকা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে তিনি জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, সর্বনাশ! আমার ভিজিট তো একটাকা। তার বেশি আমি কোন মতেই নিতে পারবো না—ও অভ্যাস আমার নেই। শ্যামবাবু, টাকা দু'দিনের, কিন্তু ধর্মটা চিরদিনের।

দুইদিন পূর্বে এখানেই যে এক টাকার অধিক আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, আজ সে কথাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। যাহা হউক, নারায়ণী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন, এবং সংসার আবার পূর্বের মতই চলিতে লাগিল।

অনুশীলনী

১। 'রামলালের কীর্তি' গল্পে রামলালের কোন্ কীর্তির কথা বর্ণিত হইয়াছিল?

২। রামলালকে কে কাহার হাতে তুলিয়া দিয়া যান?

৩। 'ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন'—ডাক্তারটি কে? তাঁহার আড়ষ্ট হইবার কারণ কি?

৪। 'রাম চুপ করিয়া রহিল।' কখন রাম চুপ করিয়া ছিল এবং কেন?

৫। ডাক্তারেরা কি দিতে পারেন এবং কি দিতে পারেন না?

৬। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর:

(ক) 'ও হতভাগার জন্য……ইচ্ছা করে।'

(খ) 'টাকা দু'দিনের, কিন্তু ধর্মটা চিরদিনের।'

৭। 'রামলালের কীর্তি' গল্পে যে চরিত্রটি তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সেই চরিত্রটি আলোচনা কর।

মহান আবিষ্কার-কাহিনী ঃ

আর্কিমিডিসের আবিষ্কার





চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

[চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—জন্ম ঃ ২৯শে জুন, ১৮৮৩; মৃত্যু ঃ ২৬শে আগষ্ট, ১৯৬১। পদার্থ বিদ্যার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। নব্যবিজ্ঞান, বিশ্বের উপাদান, পদার্থ বিদ্যার নবযুগ প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। উদ্ধৃত অংশটি সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত। উহাতে বাইশ শত বর্ষ পূর্বেকার বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের গাণিতিক পদার্থবিদ্যার মহান আবিষ্কার কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।]

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে মহাবীর আলেকজাণ্ডার আলেকজেণ্ড্রিয়া শহর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পরই এই স্থানটিতে একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠল। শিক্ষকদের মধ্যে এলেন সুপ্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিশারদ ইউক্লিড। অনতিকাল পরে এখানে যোগ দিলেন সিরাকুজবাসী আর্কিমিডিস। আলেকজেণ্ড্রিয়ায় থাকার সময় আর্কিমিডিস নানা রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে রত ছিলেন। চাষের ক্ষেতে জলসেচনের জন্য তিনি এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। স্ক্রু-আকারের একটা ফাঁপা নলের নিচের প্রান্ত জলের মধ্যে ডোবানো, স্ক্রুটা ঘোরাতে থাকলে জল নিচে থেকে উপরে উঠবে।

আলেকজেণ্ড্রিয়ায় কয়েক বছর থাকবার পর আর্কিমিডিস সিরাকুজে ফিরে এলেন। আর রাজা হীরো তাঁকে সামরিক এঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত

করলেন। একাজে তিনি খুবই পারদর্শিতা দেখাতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের উদ্ঘাটনে। এই সময়ই একদিন রাজা হীরো তাঁর মুকুট খাঁটি সোনার কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার দিলেন আর্কিমিডিসের উপর। পুরোপুরি জলে ভর্তি চৌবাচ্চায় অবগাহন করতে গিয়ে আর্কিমিডিস দেখলেন খানিকটা জল উপচে গেল। নিশ্চয়ই তাঁর দেহের সমান আয়তনের জল উপচেছে। এই কথা চিন্তা ক'রেই তিনি দৌড়তে দৌড়তে রাস্তায় বেরুলেন, আর বলতেলাগলেন, 'আমি পেয়েছি'! 'আমিপেয়েছি'! একটা খাঁটি সোনার মুকুট জলপূর্ণ পাত্রে ডোবালে খানিকটা জল উপচাবে। ততটা ওজনের খাঁটি রূপার মুকুট ডোবালে এর প্রায় দ্বিগুণ জল উপচে পড়বে। সোনা-রূপায় মেশানো ততটা ওজনের মুকুট ডোবালে যে পরিমাণ জল উপচাবে, তা আগেকার দুই-এর মাঝামাঝি। এখন রাজার মুকুট জলে ডুবিয়ে আর্কিমিডিস ধরতে পারলেন ওটা খাঁটি সোনার কিনা।

এই পরীক্ষা থেকে পৃথিবীবাসী পেল আর্কিমিডিসের সূত্র। সূত্রটা হ'ল এই—কোন জিনিসকে জলের মধ্যে ওজন করলে তার ওজন কমে যায়। কতটা কমে? সমান আয়তন জলের যা ওজন, সেই ওজন কমে। আর শুধু জল নয়, প্রত্যক তরল পদার্থ, এমন কি গ্যাসীয় পদার্থ সম্বন্ধেও এ নিয়ম খাটে। কি বেলুন উড়ানোয়, কি জাহাজ ভাসানোয়, আর্কিমিডিসের এই সূত্র আজ দু'হাজার বছর ধরে তাঁর জয়বার্তা ঘোষণা করে চলেছে।

কপিকলের সাহায্যে সুবিধাজনক স্থান হ'তে বল প্রয়োগ ক'রে একটা ভার তোলা যায়। এই কপিকলও আর্কিডিসের দান। জ্যামিতিতে ইউক্লিড যা দিয়ে গিয়েছিলেন, গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস তা নানাদিকে প্রসারিত করলেন। একটি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের মধ্যে অনুপাত তিনি নিরূপণ করলেন।....

রোমানরা সিরাকুজ রাজ্য দখল করতে এল। রাজা আর্কিমিডিসের উপর নগর রক্ষার ভার দিলেন। আর্কিমিডিস এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যা দূর থেকে বড় বড় পাথর ছুঁড়তে থাকবে। তিনি শত্রু সৈন্যকে নাস্তানাবুদ করলেন, তাদের অনেক জাহাজ ডোবালেন। তিনি আর এক কৌশল অবলম্বন করলেন। বিক্ষিপ্ত সূর্যরশ্মিকে যদি এক জায়গায় সংহত করা যায়, তবে সেখানে

প্রচণ্ড তাপ পাওয়া যাবে। আর্কিমিডিস কয়েকখানি অবতল দর্পণের সাহায্যে শত্রুর জাহাজের পালের উপর সূর্যরশ্মি সংহত করলেন, জাহাজ জ্বলে উঠল। এটা হয়ত গল্প। কিন্তু রোমান সৈন্যরা আর্কিমিডিসের উদ্ভাবন কৌশল দেখে এত ভয় পেল যে সে-যাত্রা তারা ফিরে চ'লে গেল।

কিছুদিন পরে সৈন্যরা আবার এল, আর শেষ অবধি সিরাকুজ দখল করল। রোমান সৈন্যাধ্যক্ষ মার্থেলস্ আর্কিমিডিসের প্রতিভায় এত চমৎকৃত হয়েছিলেন যে, তিনি শহর দখল ক'রে নিজের সৈন্যদের আদেশ দিলেন যে, তারা যেন আর্কিমিডিসকে কিছু না বলে। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যভাবে ঘটল। আর্কিমিডিস শত্রুর আগমনের কথা শোনেন নি। তিনি এক জায়গায় বালি ছড়িয়ে বিভিন্ন রেখা কেটে, তার উপরে লাঠি পুঁতে এক জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত ছিলেন। একজন রোমান সৈন্য সেখানে এসে আর্কিমিডিসকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করল। আর্কিমিডিস বললেন—অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আমার সমস্যার সমাধান হয়, আর এই বালির উপর পা দিও না। সৈন্যটির ধৈর্য্যচুতি ঘটল, আর তদানীন্তন কালের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নির্মমভাবে নিহত হ'লেন।

অনুশীলনী

১। আলেকজেণ্ড্রিয়া শহর কে পত্তন করেন ?

২। আর্কিমিডিস কি কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বল।

৩। আর্কিমিডিসের সূত্র কি ? কি ভাবে উহা আবিষ্কৃত হয় ?

৪। 'এই কপিকলও আর্কিমিডিসের দান।'—বৈজ্ঞানিকের অপর দান কি ?

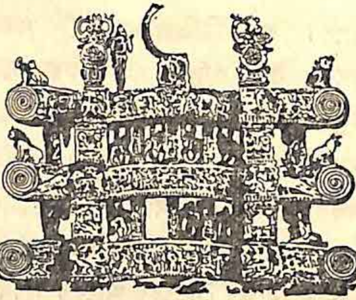
৫। সিরাকুজ আক্রান্ত হইলে কি ভাবে আর্কিমিডিস বাধা দেন ?

৬। কি ভাবে আর্কিমিডিসের জীবনাবসান ঘটে ?

৭। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : 'বিক্ষিপ্ত সূর্যরশ্মিকে……পাওয়া যাবে।'

৮। টীকা লিখ : আলেকজাণ্ডার, ইউক্লিড, হীরো, সিরাকুজ, অবতলদর্পণ।

স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক প্রবন্ধ :



প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরব

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ॥

[ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ—জন্ম : ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৯১। প্রসিদ্ধ দেশসেবক। উদ্ধৃত অংশটি তাঁহার 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' হইতে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত। ভারতের গৌরবময় অধ্যায় ইহার আলোচ্য বস্তু।]

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বলতে লোকে সাধারণতঃ আর্যসভ্যতাই মনে করে। এ ধারণা মোটামুটি ঠিক থাকলেও তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মোহনজোদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের পর কোনো কোনো মনীষী মনে করেন, ভারতে আর্য-সভ্যতা বিস্তৃতির পূর্বে সিন্ধু উপত্যকায় এক উন্নততর সভ্যতা বর্তমান ছিল এবং সেটা দ্রাবিড়ী সভ্যতা। তাঁদের মতে প্রধানতঃ আর্য ও দ্রাবিড়ী—এই দুই সভ্যতার মিলনে প্রাচীনকালে যে এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তারই নাম ভারতীয় সভ্যতা।

আর্য শব্দটি কৃষ্টিবাচক। তবে তারা ভিন্ন দেশ থেকেই আসুক বা ভারতের আদিম অধিবাসীই হোক, একথা সত্য যে আমাদের বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হয়েছিল ও বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে দুই বা ততোধিক সভ্যতার মিলন হয় এবং তার ফলে এক সভ্যতা গড়ে ওঠে—তারই নাম ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা। শুধু যে একাধিক সভ্যতার মিলন হয়েছিল তা নয়, পরস্পরের সঙ্গে বিবাহের আদান-প্রদান দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন একটি জাতিও গড়ে উঠেছিল—তারই নাম হিন্দু জাতি।

ভারতীয় সভ্যতা যেমন কোনো জাতি বিশেষের সভ্যতা নয়, তেমনি কোনো বর্ণ বিশেষেরও নয়, যদিও ব্রাহ্মণের দান যথেষ্ট। ভালো করে বিচার করে দেখলে প্রতীয়মান হবে যে, ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের দানও কম নয়। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম।

প্রাচীন ভারত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি সব বিষয়েই খুব উন্নত ছিল। সব দিক দিয়ে বিচার করলে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতে কোনো দেশ অতটা উন্নত ছিল না। হিন্দুরা অশেষ চেষ্টা ও সাধনার বলে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিল। জগৎ অনেক বিষয়ে তাদের কাছে ঋণী।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু-প্রতিভার বিকাশ নানা দিক দিয়ে হয়েছিল। কোন্ দেশে ঐ যুগে ব্যাস, বাল্মীকির মতো মহাকবি ; কালিদাস, ভবভূতির মতো কবি ; শূদ্রকের মতো নাট্যকার ; বিষ্ণুশর্মার মত গল্পলেখক ; যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, শঙ্কর প্রভৃতির মতো দার্শনিক ; পাণিনি, কাত্যায়ণের মতো বৈয়াকরণিক ; আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের মতো জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ ; চরক ও সুশ্রুতের মতো চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্ ; কৌটিল্যের মত অর্থশাস্ত্রকার ও নাগার্জুনের মতো রসায়ণবিদ জন্মগ্রহণ করেছেন ?

এই দেশেরই আর্যভট্ট সর্বপ্রথম পৃথিবীর আবর্তন জনিত দিবারাত্রি-ভেদ আবিষ্কার করেন। এই দেশেরই ভাস্করাচার্য নিউটনের পূর্বে পৃথিবীর উপর থেকে বস্তু সকল পৃথিবীর আকর্ষণে মাটিতে পড়ে—একথা বলেছিলেন। এই দেশেই সর্বপ্রথম ১ থেকে ৯ পর্যন্ত গণনাঙ্ক ও শূন্যের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়—পৃথিবীর সভ্যতায় এটা একটা মস্ত বড় দান। এই এক থেকে দশ গণনা পদ্ধতি থেকেই দশমিকের আবিষ্কার। পাটীগণিত ও বীজগণিত মুখ্যতঃ হিন্দুদেরই বিজ্ঞান। গণিতে হিন্দুরা আরবের শিক্ষাদাতা এবং আরবের মারফতে সমস্ত জগতের। বৈজ্ঞানিক ভাবে জ্যামিতির চর্চা প্রথম ভারতবর্ষেই শুরু হয়।

হিন্দুরা প্রথম সোনা আবিষ্কার করে এবং লোহার যৌগিক পদার্থ থেকে লোহা তৈরী প্রণালী অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

লোহা প্রস্তুত ও গালাই বিষয়েও প্রাচীন হিন্দুদের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ আজও তার সাক্ষ্য স্বরূপ বর্তমান।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ প্রচুর অর্থ-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাদের বাণিজ্য জাহাজ দেশ-বিদেশে যেত। ফলে সুন্দর একটি নৌ-শিল্প গড়ে উঠেছিল।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। এমন সাহিত্য-সৃষ্টি প্রাচীন জগতে আর কোথাও হয়নি। ব্যাকরণেও হিন্দুদের সমকক্ষ প্রাচীন জগতে কোনো জাতি ছিল না। বর্তমান ভাষাবিজ্ঞান সৃষ্টির মূলে ভারতীয় বৈয়াকরণিকরা—একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে।

তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, অমরাবতী, নালন্দা, কাশী, কাঞ্চি, বিক্রমশীলা, মাদুরা, বলভী প্রভৃতি বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পেও ভারত গৌরবময় স্থান অধিকার করেছিল। গুপ্তযুগের শিল্পকলা বেশ উন্নত ধরনের ছিল। অজন্তার প্রাচীর-চিত্র ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর চিত্রের সমকক্ষ। সাঁচি, ভারহুত, মথুরা, অমরাবতী, সারনাথ, অজন্তা, এলোরা, তাঞ্জোর, খাজুরাহো প্রভৃতি স্থানের শিল্পকলা নয়নমনমুগ্ধকর।

প্রাচীন ভারত শুধু যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অশেষ উন্নতিলাভ করেছিল তা নয়, তার রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও খুব সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। ইংরেজ কৃষক ইংলণ্ডে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা উপভোগ করে, মুসলমান আক্রমণের বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় কৃষক তার চেয়ে অধিক সুবিধা উপভোগ করত।

মোটকথা, একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানে, গুণে, গরিমায়, অর্থসম্পদে ও কর্মক্ষমতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

অনুশীলনী

১। ভারতীয় সভ্যতা কোন্ কোন্ সভ্যতার মিলনে গড়ে উঠেছিল ?

২। ভারতীয় সভ্যতা বলিতে লেখক কোন্ সভ্যতাকে নির্দেশ করিয়াছেন ?

৩। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : (ক) 'ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম।'
(খ) 'জগৎ অনেক বিষয়ে তাদের কাছে ঋণী।'

৪। টীকা লিখ :
ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, শূদ্রক, বিষ্ণুশর্মা, পাণিনি, যাজ্ঞবল্ক্য।

প্রাকৃতিক দৃশ্য-বর্ণনা ঃ



[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ঃ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ ; মৃত্যু ঃ ১লা নভেম্বর, ১৯৫০ । প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্প-রচয়িতা। নিসর্গ প্রকৃতি তাঁহার বহু সার্থক উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, অনুবর্তন, আদর্শ হিন্দু হোটেল, মৌরী ফুল, দেবযান, মেঘমল্লার প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা। উদ্ধৃত অংশটি 'আরণ্যক' হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত। এই অংশে জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত মোহময়ী প্রকৃতির বর্ণনা করা হইয়াছে।]

দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জনতা ও অপরাহ্ণের সিঁদুর ছড়ানো বনঝাউয়ের জঙ্গলের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না—আজকাল ক্রমশঃ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদ ও পোড়ামাটির তাজা সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।

এ মনের ভাব একদিনে হয় নাই। কত রূপে কত সাজেই যে বন্য-প্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল!—কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্তমেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুর সুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায়—অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।

* * *

একদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিব না।

মনে আছে সেদিন দোলপূর্ণিমা। কাছারির সিপাহীরা ছুটি চাহিয়া লইয়া সারাদিন ঢোল বাজাইয়া হোলি খেলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়েও নাচ-গানের বিরাম নাই দেখিয়া আমি নিজের ঘরে টেবিলে আলো জালাইয়া, অনেক রাত পর্যন্ত হেড আপিসের জন্য চিঠিপত্র লিখিলাম। কাজ শেষ করিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, রাত প্রায় একটা বাজে। শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছি। একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যে-জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করিল তাহা পূর্ণিমা-নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্না।

হয়তো যতদিন আসিয়াছি, শীতকাল বলিয়া গভীর রাত্রে কখনও বাহিরে আসি নাই কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, ফুলকিয়া বইহারের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রির রূপ এই আমি প্রথম দেখিলাম।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেহ কোথাও নাই, সিপাহীরা সারাদিন আমোদ-প্রমোদের পর ক্লান্ত দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ অরণ্যভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথরাত্রি। সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সে-রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোট খাট বনঝাউ ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চকচকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন এক বাঁধনহারা মুক্ত ভাব—মন হু হু করিয়া ওঠে, চারিদিকে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথ রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না। এই সব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরীদের বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়। আমি অনধিকার-প্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই।

তাহার পর ফুলকিয়া বইহারের রাত্রি জ্যোৎস্না কতবার দেখিয়াছি—ফাল্গুনের মাঝামাঝি যখন দুধলি ফুল ফুটিয়া সমস্ত প্রান্তরে যেন রঙীন ফুলের

গালিচা বিছাইয়া দেয়, তখন কত জ্যোৎস্না-শুভ্র রাত্রে বাতাসে দুধ্‌লি ফুলের মিষ্ট সুবাস প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিয়াছি—প্রত্যেক বারেই মনে হইয়াছে জ্যোৎস্না যে এত অপরূপ হইতে পারে, মনে এমন ভয়-মিশ্রিত উদাসভাব আনিতে পারে, বাংলা দেশে থাকিতে তাহাতো কোনদিন ভাবিও নাই! ফুলকিয়ার সেই জ্যোৎস্না রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যালোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয়, ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না—করা সম্ভব নয়! অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জনতা, অমন দিগদিগন্ত বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া উঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্না রাত্রি দেখা উচিত; যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।

অনুশীলনী

১। এ মনের ভাব একদিনে হয় নাই।—লেখক তাঁহার মনের কোন্ ভাবের কথা বলিয়াছেন?

২। 'একদিনের কথা জীবনেও ভুলিব না'—ঐ দিনটি বর্ণনা কর ও লেখক কেন উহা ভুলিতে পারিবেন না তাহা বুঝাইয়া দাও।

৩। 'মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না।'—কী প্রসঙ্গে উহা বলা হইয়াছে?

৪। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর:

(ক) 'এই মুক্তি ছাড়িয়া····· পারিব না।'

(খ) 'অন্ধকার রজনীতে······বিরাট কালীমূর্তিতে।'

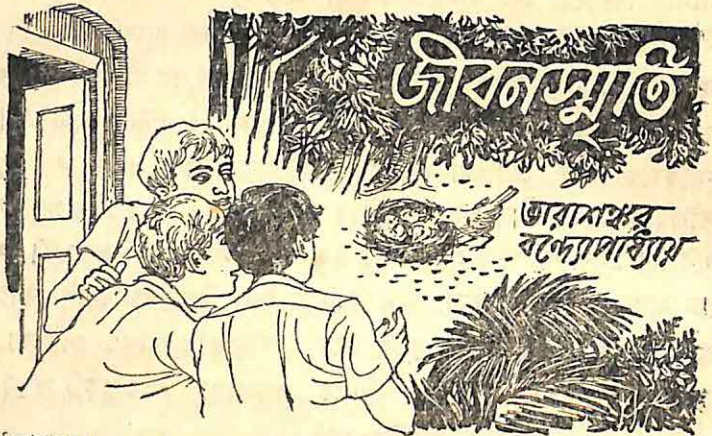
(গ) 'আমি অনধিকার······ভাল করি নাই।'

(ঘ) 'যে না দেখিয়াছে······রহিয়া গেল।'

৫। টীকা লিখ: কাছারি, হেড অফিস, ফুলকিয়া বইহার, গালিচা, হোলি।

৬। বাক্য রচনা কর: উন্মাদিনী, ভৈরবী, নিশীথিনী, হিমস্নিগ্ধ, বিসর্পিত।

স্মৃতিচারণমূলক কাহিনী :



[তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্ম : ২৩শে জুলাই, ১৮৯৮ ; মৃত্যু : ১৯৭১। আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। তাঁহার বহু উপন্যাস রাঢ়ভূমির জীবনবেদ। উদ্ধৃত অংশটি 'আমার সাহিত্য জীবন' হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত। লেখকের সাহিত্য প্রতিভা উন্মেষক্ষণের এক কাহিনী এখানে বলা হইয়াছে।]

আমার জীবনের প্রথম রচিত কবিতা খড়ি দিয়ে লিখেছিলাম আমাদের বৈঠকখানা বাড়ির একটা খড়খড়িওয়ালা দরজার গায়ে। তখন বয়স আমার সাত বৎসর—আটে পঁড়েছি। আমার বয়স যখন ছাব্বিশ-সাতাশ, তখন আমিই নিজে একদিন সাদা রঙ দিয়ে দরজাটা রঙ করে সে লেখা মুছে দিয়েছি।

অল্পস্বল্প ছড়া কবিতা—এ ছেলেরা ছ-সাত বছর থেকেই মুখে মুখে রচনা করে চিরকাল। যে সবচেয়ে কম রচনা করে—সেও অন্ততঃ অন্যের উপর বিরক্ত হয়ে তার নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করে বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করে থাকে।

আমার দরজায় লেখা কবিতাটি কিন্তু ও-ধরনের ব্যঙ্গ-কবিতা নয়। যাকে বলে জাত-কবিতা, তাই। দস্তুরমত করুণ রস অবলম্বন করে লেখা। তিন বন্ধুতে খেলা করছিলাম, হঠাৎ আমাদের বৈঠকখানার সামনের বাগানে একটি গাছের ডালের পাখির বাসা থেকে একটি পাখির বাচ্চা পড়ে গেল মাটিতে। তিনবন্ধুতে ছুটে গিয়ে তাকে সযত্নে তুলে এনে বাঁচাবার এমনই মারাত্মক চেষ্টা করলাম যে বাচ্চাটি বার কয়েক খাবি খেয়েই মরে গেল। বালক

মনে একটি করুণ রসের ধারা সঞ্চারিত করে গেল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিল পাঁচু। তার জিহ্বায় ছিল জড়তা, সব সময় সবতাতেই সে হি-হি করে হাসত। আর একজন ছিল, তার নাম দ্বিজপদ। তিনজনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম বোধহয়। তারপর কল্পনা করেছিলাম বাগানের মধ্যে পক্ষী-শাবকটির সমাধি রচনার। যেমন কল্পনা তেমনি কাজ। ভাঙা ডালের টুকরো নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেলাম।

পাঁচু হঠাৎ বললে—দেখ দেখ।

—কি?

—পাখিতার মা এচেছে। দাক্‌ছে।

সত্যিই পক্ষীমাতা বাসায় ফিরে শাবকটিকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে মরা ছানাটির পাশে এসে ঠোঁট দিয়ে তাকে নাড়া দিচ্ছে—ডাকছে। একটি 'আহা' শব্দ আমাদের তিনজনের মুখ দিয়েই বোধহয় বেরিয়েছিল। কিন্তু বালক চরিত্র বিচিত্র। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজপদ পা টিপে টিপে পক্ষীমাতাকে ধরবার জন্য অগ্রসর হল। পক্ষীমাতা উড়ল এবং কিচ-কিচ শব্দ করে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল মাথার উপর।

হঠাৎ পাঁচুর হাত দিয়ে কবিতা বেরিয়ে গেল। সে একটা খড়ি দিয়ে আমাদের ওই দরজায় খসখস করে দু-লাইন কবিতা রচনা করে ফেলল:

তারাদাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি
তার মা এসে কাঁদিতেছে কেঁউ কেঁউ করি।

'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' কবিতার ছন্দ পাঁচুর তখন আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে কিন্তু দোলা লেগে গেল। পাঁচু—পেঁচো! যার জিহ্বায় জড়তা, অহরহ অস্থির চঞ্চল যে পেঁচো, পাঠশালা পলাতক যে পেঁচো, সেই পেঁচো, খসখস করে পদ্য লিখে ফেললে? একেবারে ছন্দে গেঁথে মিল দিয়ে পদ্য! প্রাপ্তবয়স্ক রসিকজনও কবিতার মিল খুঁজে পাবেন না। কিন্তু আমি সেদিন মিল পেয়েছিলাম—'আজি' এবং 'করি' শব্দ দুইটি হ্রস্ব-ই কারান্ত, ওই হ্রস্ব-ই—হ্রস্ব ই-য়ে মিল দেখেছিলাম। আমার কাছে সে কবিতা সেদিন প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলে মনে হয়েছিল।

দ্বিজপদ কিন্তু এতে এতটুকুও চঞ্চল হয়নি, প্রেরণাও পায়নি। আমি হলাম, আমি প্রেরণা পেলাম। ওদিকে পাখির মা তখনও কাঁদছে, একবার এসে ছানার পাশে বসে ঠোঁট দিয়ে নাড়ছে, আবার উড়ে গিয়ে ডালে বসছে। আমিও পাঁচুর খড়িটি নিয়ে পাঁচুর কবিতার নিচে লিখলাম—

পাখির ছানা মরে গিয়েছে
মা ডেকে ফিরে গিয়েছে
মাটির তলায় দিলাম সমাধি
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।

মানুষ মরলে শিশু বালক তেমন উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু তার প্রিয় পাখিটি কি কুকুরটি যখন মরে তখন সে কাঁদে, তাকে সমাধি দেয়, তার উপর তার চিত্তের স্বতোৎসারিত বেদনাপ্লুত কাব্য উৎকীর্ণ করে দেয় সে। আমাদের গ্রামে ঢুকবার মুখেই পথের পাশে এমনি একটি কুকুরের সমাধি ছিল। তার উপর আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা ছিল—"সমাধি মোদের ভুকুর—আমাদের ভাল কুকুর।" কুকুরটার নাম ছিল ভুকু।

অনুশীলনী

১। জীবনস্মৃতির লেখক কখন তাঁহার রচিত প্রথম কবিতা কোথায় লিখিয়াছিলেন?

২। লেখকের প্রথম কবিতা রচনার মূলে যে কাহিনীটি আছে, তাহা বিবৃত কর।

৩। পেঁচোর কবিতায় কোন্ দুটি শব্দের মিল ছিল?

৪। 'আমি হলাম, আমি প্রেরণা পেলাম।' বক্তা কে? তিনি কি হলেন, কিসের প্রেরণা পেলেন?

৫। তিনজনের মুখ দিয়ে কি শব্দ বেরিয়েছিল?

৬। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর: (ক) 'মানুষ মরলে……করে দেয় সে।'

———

ভ্রমণ-কাহিনী ঃ



[শ্রীঅন্নদা শঙ্কর রায়—জন্ম ঃ ১৫ই মার্চ ; ১৯০৪। প্রখ্যাত কবি ও বিদগ্ধ সাহিত্যিক। পথে-প্রবাসে, সত্যাসত্য, বিনুর বই, ইসারা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। উদ্ধৃত অংশটি 'পথে-প্রবাসে' নামক ভ্রমণ-কাহিনী হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত। লেখকের লণ্ডন ভ্রমণপথের অভিজ্ঞতাই এখানে বর্ণিত হইয়াছে।]

ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম। জাহাজে উঠে বম্বে দেখ্‌তে যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। এতবড় ভারতবর্ষ এসে এতটুকু নগরপ্রান্তে ঠেকেছে, আর কয়েক মুহূর্তে এটুকুও স্বপ্ন হবে, তখন মনে হবে আরব্য উপন্যাসের প্রদীপটা যেমন বিরাটাকার দৈত্য হয়ে আলাদিনের দৃষ্টি জুড়ে ছিল, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা তেমনি মাটি জল ফুল পাখি মানুষ হয়ে আজন্ম আমার চেতনা চেয়েছিল, এতদিনে আবার যেন মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

জাহাজ টল্‌তে টল্‌তে চল্‌ল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রি-যাত্রিনী ডেক ছেড়ে শয্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্রপীড়ায় প্রথম তিনদিন আচ্ছন্নের মতো কাটল, কারুর সঙ্গে দেখা হবার জো ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। ক্যাবিনে পড়ে পড়ে বমনে ও উপবাসে দিনের পর রাত,

রাতের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ বা ভাবে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ বা ভাবে মরতে আর দেরি নেই। সমুদ্র-পীড়া যে কী দুঃসহ, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না। ইচ্ছে করে কেবল চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতে, প'ড়ে প'ড়ে আকাশ পাতাল ভাবতে।

সদ্য-দুঃখার্ত কেউ সঙ্কল্প করে ফেল্লেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন, সমুদ্রযাত্রার দুর্ভোগ আর সইতে পারবেন না। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক করে ফেল্লুম মার্সেল্‌সে নেবে প্যারিসের পথে লণ্ডন যাব।

আরবসাগরের পরে যখন লোহিতসাগরে পড়লুম, তখন সমুদ্র-পীড়া বাসি হ'য়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্তী এই হ্রদতুল্য সমুদ্রটি দুর্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটার ওপর মায়াও প'ড়ে গেছে; তখন না মনে পড়ছে দেশকে, না ধারণা করতে পারা যাচ্ছে বিদেশকে। তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চল্‌তেই ইচ্ছা করে, কোথাও থামবার বা নামবার সংকল্প দূর হয়ে যায়।

লোহিতসাগরের পরে ভূমধ্যসাগর। দু'য়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘটকালিতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোর খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা তা ঘটল তার নাম সুয়েজ কেনাল। সুয়েজ কেনাল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেন নি, লেসেপস্‌ তা পারলেন।

সুয়েজ কেনাল আমাদের দেশের যে-কোন ছোট নদীর মতোই অপ্রশস্ত, এতে বড় জোর দুখানা জাহাজ পাশাপাশি আসা-যাওয়া করতে পারে। কিন্তু কেনাল যেখানে হ্রদে পড়েছে, সেখানে এমন সংকীর্ণতা নেই। কেনালটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দিকে নানান রকমের গাছ যত্ন ক'রে লাগানো, যত্ন ক'রে রক্ষিত; অন্যদিকে ধূ ধূ মাঠ, শ্যামলতার আভাসটুকুও নেই।

কেনালটি যেখানে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে নেমে শহরটায় বেড়িয়ে আসা গেল। শহরটায়

বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ফরাসী প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কাফেতে খাবার সময় ফুটপাতের ওপর ব'সে খেতে হয়, রাস্তায় চলবার সময় ডানদিক ধরে চলতে হয়।

পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে পড়লুম। শান্ত শিষ্ট ব'লে ভূমধ্য-সাগরের সুনাম আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলে না। আর একবার কেউ কেউ শয্যাশায়ী হলেন। অধিকাংশকে মার্সেল্‌সে নামতেই হলো।

মার্সেল্‌স ভূমধ্যসাগরে সেরা বন্দর ও ফরাসীদের দ্বিতীয় বড় শহর। এর পূর্বদিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট ছোট অসংখ্য গ্রাম, সেই সব গ্রামে গ্রীষ্মযাপন করতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। মার্সেল্‌স শহরটাও পাহাড় কেটে তৈরি ; ওর একটা রাস্তার সঙ্গে আরেকটা রাস্তা সমতল নয়।

মার্সেল্‌স থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাটল। প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লণ্ডন।

অনুশীলনী

১। জাহাজে উঠে বম্বে দেখতে কেমন লাগে ?

২। লণ্ডনযাত্রার পথে লেখকের অভিজ্ঞতাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। সমুদ্রপীড়া কি ? লেখক ও তাহার সহযাত্রিগণ সমুদ্রপীড়ায় কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন ও সেইক্ষণে কি সংকল্প করিয়াছিলেন ?

৪। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ কর :

লোহিতসাগরের পরে ——। দু'য়ের মাঝখানে যেন একটি —— ছিল, নাম ——। এই যোজকের ঘটকালিতে এশিয়া এসে —— হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোর খুলে দিল ——।

৫। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর :

(ক) 'এতবড় ভারতবর্ষ·········রূপান্তরিত হয়েছে।'

(খ) 'তখন গতির·········দূর হয়ে যায়।'

(গ) 'কলম্বাস যা ·····তা পারলেন।'

৬। টীকা লিখ : মার্সেলস্, সুয়েজ যোজক, পোর্ট সৈয়দ, ডোভার, কলম্বাস।

স্বাধীনতা-সংগ্রামীর জীবন-কাহিনী ঃ



[শ্রীভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় দেশপ্রাণ ও স্বাধীনতাকামী। তাঁহার 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশটি সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত হইয়াছে।]

কলকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড। ১৯০৭ সালে এই শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ দেশবাসীর তৎকালের হৃদয়ের নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। স্বদেশী আন্দোলন দমন-কার্যে কিংসফোর্ডের উৎসাহ অন্তহীন। তাই বিপ্লবী আদালতের বিচারে কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ড স্থির হয়ে গেল।

ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল কুমার চাকি নামক দু'টি তরুণ কিশোরের উপর আদেশ হল মজঃফরপুর গিয়ে কিংসফোর্ডকে নিধন করার। বোমা ও রিভলবার সহ তাঁরা রওনা হলেন। সেটা ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস। তরুণদ্বয় মজঃফরপুর শহরে একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। কিন্তু সাহেবকে বাগে পাওয়া যাচ্ছে না।

সেদিন ৩০শে এপ্রিল। বিপ্লবীদ্বয় খবর পেয়েছেন যে ক্লাবগৃহে কিংসফোর্ড-দম্পতি এবং কেনেডি-গৃহিণী ও তার অনূঢ়া কন্যা তাস খেলছেন। তাসখেলা সাঙ্গ হলে কিংসফোর্ড-দম্পতি এবং কেনেডি-গৃহিণী ও কন্যা পরপর দুখানা গাড়িতে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন।

প্রথম গাড়ি কিংসফোর্ডের বাড়ির গেট-বরাবর আসতেই সুদীর্ঘ একটি গাছের আড়াল থেকে সহসা ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়ে উক্ত গাড়ির সম্মুখে এসে পড়লেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকুমার। এসেই প্রচণ্ড বিক্রমে বোমানিক্ষেপ করলেন গাড়িখানা লক্ষ্য করে। দিগন্ত কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। গাড়ি শতধাবিচূর্ণ।.........

কাজ শেষ করে তরুণদ্বয় অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু উভয়েই পায়ের জুতা ফেলে এসেছেন। থানায় থানায়, স্টেশনে স্টেশনে পুলিশ খবর পাঠাল যে হত্যাকারী তরুণদ্বয় খালি পায়ে পালিয়েছে।

কিছুদূর একসঙ্গে পালিয়ে এসে একস্থানে দুজনের ছাড়াছাড়ি হল মানুষের সন্দেহ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। একজন ছুটে চললেন সমস্তিপুরের দিকে, অপরজন ছুটে চললেন রেললাইন ধরে অন্যপথে।

এদিকে দুর্ভাগ্যবশতঃ মিসেস কেনেডির গাড়িতেই বোমা পড়েছিল।... কেনেডি-গৃহিণী ও তাঁর কন্যার মৃত্যু হয়েছে। নির্দোষ দু'টি মহিলার মৃত্যুতে সবার অধিক দুঃখ পেয়েছিলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি।

প্রফুল্ল চাকি সমস্তিপুর স্টেশনে পৌঁছলেন। মোকামাঘাটের টিকিট কাটলেন ১লা মে তারিখে (১৯০৮)। ইতিমধ্যে নূতন জামা-কাপড় ও জুতা পরে নিয়েছেন। কিন্তু দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জির দুষ্ট নজর এড়াতে পারলেন না। কর্মতৎপর হয়ে উঠল নন্দলাল।

প্রফুল্ল চাকি ট্রেন থেকে নামতেই বন্ধুর বেশে নন্দলাল এসে কর্তাদের নির্দেশমত তাঁকে গ্রেপ্তার করল।...প্রফুল্লর দেহে অসীমশক্তি। এক ঝটকায় নিজেকে পুলিশের কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে তিনি দৌড় দিলেন। প্লাট-ফরমের একপ্রান্তে এসে গেছেন। মুহূর্তে রিভলবারের নল ঘুরিয়ে নিলেন

নিজের দিকে। প্রচণ্ড শব্দে পরপর দু'টি গুলি ছুটে এসে তার আত্মবিলয়ন ঘটাল। অফুরন্ত বীর্যের অধিকারী মহান বীর মৃত্যুকে পরম প্রেমিকের মত বরণ করলেন। তখন অপরাহ্ণ ৬টা।

প্রফুল্ল চাকিকে ছেড়ে ক্ষুদিরাম ছুটলেন রেললাইন ধরে কোন স্টেশন ধারে-কাছে পাবার প্রত্যাশায়। তিনি পৌঁছলেন এসে 'উইনি' স্টেশনে। এতদূর পথ ছুটে এসে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অবসন্ন তাঁর দেহ। বুভুক্ষু কিশোর স্টেশনের অনতিদূরে বাজারে ঢুকলেন। তখন ভোর ৮টা। এক দোকানীর কাছ থেকে চিঁড়ে কিনে খেলেন। তারপর জলখাবার জন্যে এগুতেই পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। শৃঙ্খলিত ক্ষুদিরাম সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টিত হয়ে মজঃফরপুরে আনীত হলেন সেইদিনই অপরাহ্ণে। স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। বিদ্রোহী কিশোরকে দেখার জন্যে সকলে উৎসুক। মজঃফরপুরের আকাশ বাতাস সেই সন্ধ্যায় মাতৃমন্ত্রে পূত হয়ে গেল। ক্ষুদিরাম মুহূর্তে জনমানসে মুক্তি-দূতের স্থান অধিকার করে বসলেন।

বিচার শুরু হলো ২১শে মে। ২৫শে মে মজঃফরপুর বোমার মামলা নামে ক্ষুদিরামের মামলা সেসান কোর্টে নেওয়া হলো। সেখানে ক্ষুদিরামের হল ফাঁসির হুকুম। তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। দেহের ওজন ইতিমধ্যে দু'পাউণ্ড বেড়ে গেছে। হাইকোর্টের বিচারে ফাঁসের হুকুম বজায় থাকল।

১৯০৮ সালের ১১ই আগস্টের প্রভাত ৬ ঘটিকায় মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসির মঞ্চে সগৌরবে আরোহণ করেছেন।

বাঙলার শহরে শহরে, গ্রামে-গ্রামান্তরে কত গান রচিত হল এই কিশোর বীরের উদ্দেশ্যে—স্তুতি ও বন্দনা জানিয়ে। পথের ভিখারীর কণ্ঠে আজও শুনি—'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'।......

ভারতের মৃত্যুহীন কিশোরদের এই অগ্রদূত আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে যে আলোক-শিখা জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন, বন্দীর গৌরবে তা দেশ-কাল-ব্যাপ্তি জুড়ে অম্লান থাকবে—যেমন অম্লান হয়ে আছে ও থাকবে শৃঙ্খলিত প্রমিথিয়ুস-এর মানব কল্যাণে জ্বালিয়ে দেওয়া প্রথম অগ্নিশিখা।

অনুশীলনী

১। মিঃ কিংসফোর্ড কে ছিলেন ?

২। তাঁকে নিধন করবার ভার কাদের উপর দেওয়া হল ?

৩। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির মৃত্যু হল কি ভাবে ?

৪। 'সেদিন ৩০শে এপ্রিল !'—ঐদিনের ঘটনা ও ঘটনার ফলশ্রুতি বর্ণনা কর।

৫। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকি কিভাবে ধরা পড়েন ও আত্মহত্যা করেন ?

৬। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারবরণ ও মৃত্যুকে বরণ করিবার কাহিনী বর্ণনা কর।

৭। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : (ক) 'অফুরন্ত বীর্যের……বরণ করিলেন।'
(খ) 'ভারতের মৃত্যুহীন…অম্লান থাকবে।'

৮। শূন্য স্থান পূর্ণ কর :

—— সালের—— আগস্টের প্রভাত——ঘটিকায়—জেলে ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসির মঞ্চে সগৌরবে আরোহণ করেছেন।

৯। টীকা লিখ : মিঃ কিংসফোর্ড, নন্দলাল ব্যানার্জী, প্রমিথিয়ুস।

[জ্ঞাতব্য : প্রফুল্ল চাকি—পরাধীন ভারতের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ। তাঁহার নিবাস ছিল রংপুরে। ১৫ বৎসর বয়সে যখন তিনি রংপুর জিলা স্কুলে পড়িতেন, তখনি তাঁহার সহিত বারীন্দ্রকুমারের পরিচয় হয়। ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত গুপ্ত বৈপ্লবিক তৎপরতার প্রায় সকলগুলির সহিতই তিনি যুক্ত ছিলেন।

ক্ষুদিরাম বসু—জন্ম : ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯ ; মৃত্যু : ১১ই আগষ্ট, ১৯০৮। ক্ষুদিরাম ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর-বিপ্লবী। মেদিনীপুর জিলার মৌরানি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ বসু। তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। ১৯০২ সালে মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতি গঠিত হইলে সমিতির কর্তা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ঐ সমিতির মধ্যে গ্রহণ করেন।]

ভ্রমণ কথা ঃ



[সৈয়দ মুজতবা আলী—জন্ম ঃ ১৯০৪ ; মৃত্যু ঃ ১৯৭৪। বিদগ্ধ কথা-সাহিত্যিক। পাণ্ডিত্য ও রসরসিকতায় পরিপূর্ণ সাহিত্য রচনায় সিদ্ধপুরুষ। দেশে-বিদেশে পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। উদ্ধৃত অংশটি তাঁহার 'দেশে-বিদেশে' নামক ভ্রমণ-কাহিনী হইতে সংক্ষিপ্তকারে গৃহীত। ইহাতে কাবুলের পথযাত্রার বিবরণ ও অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে।]

খাইবার পাস তো দুঃখে-সুখে পেরুলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমল বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল—তা সে সঙ্কীর্ণই হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোন বালাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির উপরে যে দাগ পড়েছে, তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের উপর দিয়ে পণ্য-বাহিনীর যেতে-আসতে কোন অসুবিধা হয় না ; কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক হতে পারে, তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙ্গা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গরুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে—যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোষক না থাকে, এবং ছোট-বড় নুড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

আহমদ আলী যাত্রাকালে আমার মাথায় একটা দশগজী বিরাট পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন। খাইবার পাসের মাঝখানে সে পাগড়ী আমাকে সর্দি-গর্মি থেকে বাঁচিয়েছিল; এখন সেই পাগড়ী আমার মাথা এবং গাড়ির ছাতের মাঝখানে বাফার-স্টেট হয়ে উভয় পক্ষকে গুরুতর লড়াই-জখম থেকে বাঁচাল।

সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, পাগড়ী আর কোন কাজে লাগে কিনা। তিনি বললেন, 'আরো বহু কাজে লাগে কিন্তু উপস্থিত একটার কথা মনে পড়ছে। বিশেষ অবস্থাতে শুধু কলসীতেই চলে; দড়ি কেনার দরকার হয় না।'

দুঃখ হল। ষাট বৎসর বয়স হতে চলল, কোথায় না সর্দারজী দেশের গাঁয়ে তেঁতুলের ছায়ায় নাতি-নাতনীর হাতে হাওয়া খেতে খেতে পল্টনের গল্প বলবেন, আর কোথায় আজ এই একটানা আগুনের ভিতর পেশওয়ার-কাবুলে মাকু মারা।

কী দেশ! দুদিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে নুড়ি আর নুড়ি। যেখানে নুড়ি আর নেই, সেখান থেকে চোখে পড়ে বহুদূরে আবছায়া আবছায়া পাহাড়। দূর থেকে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করলুম লক্ষ বৎসরের রৌদ্রবর্ষণে তাতেও সজীব কোনকিছু না-থাকারই কথা। রেডিয়েটারে জল ঢালার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল; তখন লক্ষ্য করলুম এক কণা ঘাসও দুই পাথরের ফাঁকে কোথাও জন্মায়নি। পোকা-মাকড়, কোনো প্রকারের প্রাণের চিহ্ন কোথাও নেই—খাবে কি, বাঁচবে কি দিয়ে? মা ধরণীর বুকের দুধ এদেশে যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে; কোনো ফাটল দিয়ে কোনো বাঁধন ছিঁড়ে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত বেরোয় নি।

তারপর দেখি মৃত্যুর বিভীষিকা। প্রকৃতি এই মরুপ্রান্তরে প্রাণ সৃষ্টি করেন না বটে, কিন্তু প্রাণ গ্রহণে বিমুখ নন। রাস্তার ঠিক উপরেই পড়ে আছে উটের এক বিরাট কঙ্কাল। গৃধিনী শকুনি অনাহারে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়ে এখানে আসে না বলে কঙ্কাল এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েনি। রৌদ্রের প্রকোপে ধীরে ধীরে মাংস শুকিয়ে গিয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়েছে।

লাণ্ডিকোটাল থেকে দক্কা দশমাইল।

সেই মরু প্রান্তরে দক্কাদুর্গ অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হল। মাটি আর খড়

মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে আশে পাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে—ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রঙ। দেয়ালের উপরের দিকে একসারি গর্ত ; দুর্গের লোক তারি ভিতর দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শত্রুকে গুলী করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অন্ধের উপড়ে-নেওয়া চোখের শূন্যকোটর।

কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বাঁ-দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছেন—ডানদিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। পলি মাটি জমে গিয়ে যেটুকু মেঠো রসের সৃষ্টি হয়েছে, তারি উপরে ভুখা দেশ ফসল ফলিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম ; মনে হল ভিজে সবুজ নেকড়া দিয়ে কাবুল নদী আমার চোখের জ্বালা ঘুচিয়ে দিলেন। মনে হল ঐ সবুজটুকুর কল্যাণে সে-যাত্রা আমার চোখ দুটি বেঁচে গেল। না হলে দক্কা দুর্গ-প্রাকারের অন্ধ কোটর নিয়ে আমাকেও দিশে-হারা হয়ে ঐ দেয়ালেরই মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

কাবুলী বললেন, 'চলুন, দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারী কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তাহলে সন্ধ্যার আগেই জালালাবাদ পৌঁছাতে পারব।'

অনুশীলনী

১। কাবুলের পথে লেখকের অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। 'দুঃখ হল'—কাহার জন্য, কি কারণে কাহার দুঃখ হইয়াছিল ?

৩। 'কী দেশ !'—কোন্ দেশের কথা বলা হইয়াছে ? সেই দেশের বর্ণনা দাও।

৪। দক্কাদুর্গ কোথায় ? ঐ স্থানে লেখকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

৫। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : (ক) 'মা ধরণীর……গিয়েছে'। (খ) 'প্রকৃতি এই……বিমুখ নন'। (গ) 'মনে হল……বেঁচে গেল।'

৬। টীকা লিখ : খাইবার পাস, লাণ্ডিকোটাল, দক্কাদুর্গ, কাবুল নদী।

নিসর্গ-প্রকৃতি বর্ণনা :



[শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল। জন্ম : ১৯০৭। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ভ্রমণ-কাহিনী রচয়িতা। প্রিয়বান্ধবী, মহাপ্রস্থানের পথে, সরলরেখা, নদ ও নদী, হাস্থবান্থ, দেবতাত্মা হিমালয়, উত্তর হিমালয়-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। উদ্ধৃত অংশটি দেবতাত্মা হিমালয় হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত। জম্মু হইতে কাশ্মীর গমনপথের রমণীয় নিসর্গ-প্রকৃতি-চিত্রই এখানে চিত্রিত হইয়াছে।]

কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম।—

ধবলাধার গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে সোজা উত্তরে, উত্তর থেকে পূর্বদিকে তার শাখা-প্রশাখা। আমরা যাবো উত্তর-পশ্চিমে, ইরাবতী নদী পেরিয়ে জম্মুর দিকে। প্রভাতের প্রখর রক্তরশ্মির নীচে দিয়ে দেখে এসেছি শীতল সাগর হ্রদ, অতিক্রম করে এসেছি বিপাশার গৈরিক স্রোত। দেখে এসেছি এই সুদূর উত্তরেও ছড়িয়ে রয়েছে বাঙলাদেশ এখানকার পথে-প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে আর গুল্মলতায়—সমস্ত নীলাভ ঐশ্বর্য সম্ভার নিয়ে। দূরে দূরে ধূমাভ গিরিশ্রেণীর

স্তবকে স্তবকে শ্রাবণ শেষের বর্ষণক্লান্ত মেঘের দল বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রজাপতি পতঙ্গেরা পথে বেরিয়ে পড়েছে সূর্যকিরণে।

সমগ্র কাশ্মীর দুই ভাগে বিভক্ত। পীর পাঞ্জালের এপার হোলো জম্মু উপত্যকা, ওপার হোলো কাশ্মীর উপত্যকা।...মাধোপুর ছাড়িয়ে ইরাবতীর পুল পেরিয়ে লক্ষ্মণপুর পিছনে রেখে আমরা চললুম পশ্চিম দিকে। শাল-সেগুন আর শিসমের বনচ্ছায়াময় পাখিডাকা উপত্যকা-পথ মধুর লেগেছে মনে মনে। দক্ষিণের হায়দারাবাদের মতো এদিকে পাঞ্জাবের সুদীর্ঘ কোন কোন অঞ্চল মালভূমির মতো; রুক্ষ রক্তিম পর্বতের সানুদেশ লতাগুল্ম বিজড়িত। তারই ভিতর দিকে কোথাও কোথাও পীর পাঞ্জালের বন্য নদীর রক্তবরণ প্রবাহ ছুটে চলেছে।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। আমাদের মোটরবাস এসে দাঁড়ালো জম্মু শহরে। ঘণ্টা খানেকের মত ছুটি পাওয়া গেল। জম্মু হোলো পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের মিলন ক্ষেত্র। বড় শহর, মস্ত বাজার হাট। পথঘাট অপ্রশস্ত,—পার্বত্য শহরে যেমন হয়।

জম্মু থেকে উধমপুর বেশী দূরে নয়। এবার আশে পাশে অল্পস্বল্প পাওয়া যাচ্ছে পার্বত্য প্রাচীর। ধীরে ধীরে উঠছি চড়াই পথে। নিস্তব্ধ উধমপুর। অদূরে বট অশ্বত্থর ছায়াচ্ছন্ন লোকে একটি মন্দির দেখা যাচ্ছে।

উধমপুর ছেড়ে গাড়ী ছুটে চললো এবার চড়াই পথ ধরে। এবার যেন শতদলের এক একটি দল মেলছে। পূর্বদিকে এবার ধবলাধারের বিস্তার,— গোধূলির আর বিলম্ব নেই। এপাশে ওপাশে নামছে গিরিনির্ঝরিণীরা, ওদের নূপুর-নিক্কণ কানে আসছে, শুনতে পাচ্ছি কলকণ্ঠির গুণগুনানী। সমতল জগতে ওদেরকে কোথাও পাইনে; ওরা থাকে হিমালয়ের পারিজাত কাননের আড়ালে আবডালে। আজ শুক্লাসপ্তমী।

রাত প্রায় নয়টায় বানিহাল বস্তির উৎরাই পথে গাড়ী এসে পৌঁছলো। চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে এই বানিহালের অধিত্যকা। ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে। আগামী প্রভাতে সাতটায় আবার আমাদের গাড়ী ছাড়বে।

সকালে উঠে দেখি নিস্তব্ধ পাহাড়পল্লী। তখনও ঠিকমতো বানিহালের ঘুম ভাঙেনি। রঙীন পাখিরা পীর-পাঞ্জাল থেকে নেমে এসেছে অধিত্যকায়।

গাড়ী ছেড়ে চললো উত্তর পর্বতের চড়াই পথে। আমরা চলেছি বানিহাল গিরিসঙ্কটের দিকে। বাতাস ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হচ্ছে। বর্ষায় ফল হয়েছে প্রচুর। ফুলশয্যা পাতা হয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। শ্রাবণের নূপুর-ঝুমুর শোনা গেলেই হৃৎপিণ্ডের থেকে বেরিয়ে আসে মৌসুমী ফুল বর্ষার অভ্যর্থনায়। সমগ্র পীর-পাঞ্জালেরই এই প্রকৃতি, এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য।

চড়াইয়ে উঠছে মোটর বাস, প্রচণ্ড হাঁসফাঁস শব্দ হচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে দেখছি অনেকদূরে রয়ে গেল বানিহাল গ্রাম। ক্রমে আমাদের গাড়ী এসে পৌঁছলো পর্বতচূড়ার কাছাকাছি স্বল্পপ্রসার একটি মালভূমিতে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা গেল সশস্ত্র সামরিক প্রহরী বানিহাল গিরিগহ্বরের প্রবেশপথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে। কাশ্মীর ও ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে এই একমাত্র সুড়ঙ্গপথ,—অন্য পথ নেই। আমাদের গাড়ী কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। একটি মিলিটারী কন্‌ভয় পেরিয়ে যাবার পর আমাদের বাস ঢুকলো সেই অন্ধকার গহ্বরলোকে। দীর্ঘপথ সত্যই অন্ধকার, ঘুটঘুটি। পিছনে জম্মু, সামনে কাশ্মীর।

ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় মিনিট তিনেক। সত্যি বলবো, ঠিক এ প্রকার ধারণা আমার আগে ছিল না। অন্ধকার থেকে আলোয় আসামাত্র কাশ্মীরের দৃশ্য যে অবাকবিস্ময়ের ধাক্কা দেয়, সেটি বিচিত্র। কিছুক্ষণের জন্য চেতনা লোপ পায়। চতুর্দিকে শতশত মাইল পরিব্যাপ্ত চিরতুষারময় হিমালয়, তাদেরই কোলে-কোলে ভাসছে মেঘের দল। উপর থেকে দেখছি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে তারা, এবং তাদের ভিতরে-ভিতরে পলকে-পলকে রামধনু তরঙ্গায়িত হচ্ছে নানাবর্ণে। মিনিট দুই হতচেতন হয়েছিলুম।

গাড়ী এবার নামতে লাগলো আপার মুণ্ডার পথ বেয়ে। অনেকদূর নীচে সেই পৃথিবীপ্রসিদ্ধ 'পপলার এভেন্যু' পথটি ছবির মতো চোখে পড়ে। সমগ্র বিরাট উপত্যকা নীলাভ সবুজ, এবং বর্ষার শেষপ্রান্তে এসে সজল শ্যামল শোভায় ঝলমল করছে।

গাড়ী ছুটেছে, ছুটেছে দূর থেকে দূরান্তরে, মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ। একসময় প্রখর রৌদ্রের ভিতর দিয়ে আমাদের বাস এসে পৌঁছলো আধুনিক শ্রীনগর শহরের এক মোটর স্ট্যাণ্ডে।

অনুশীলনী

১। (ক) 'রূপময়ী জম্মু-কাশ্মীর' নিবন্ধটি কোন্ গ্রন্থের অংশ?

(খ) বর্ষণক্লান্ত মেঘের দল কোথায় বিশ্রাম নিচ্ছে?

(গ) পীর-পাঞ্জালের এপারে-ওপারে কি আছে?

(ঘ) রঙ্গীন পাখিরা কোথা থেকে অধিত্যকায় নেমে এসেছে?

(ঙ) কারা বানিহাল গিরিগহ্বরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে?

(চ) কাদের ভিতরে ভিতরে রামধনু তরঙ্গায়িত হচ্ছে?

(ছ) কোন্ পথটি ছবির মত চোখে পড়ে?

২। জম্মু হইতে কাশ্মীরের পথে লেখক যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। বানিহালের পাহাড়পল্লীর বর্ণনা দাও।

৪। 'অন্ধকার থেকে……সেটি বিচিত্র'। —সেই বিচিত্র সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

৫। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর: (ক) 'সমগ্র পীর-পাঞ্জালেরই……দাক্ষিণ্য।'

৬। টীকা লিখ: পীর-পাঞ্জাল, মালভূমি, কনভয়, আপারমুণ্ডা, উধমপুর।

মহৎ জীবন-কথা ঃ



দিব্যপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

প্রিয়ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রীঅরবিন্দের মহৎ জীবন-কাহিনীই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।]

পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের দুশ্চর সাধনার দ্বারা যুগে যুগে বিশ্বের প্রভূত কল্যাণও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিজ চরিত্রবলে জাতির আত্মিক উন্নতির পথনির্দেশ করিয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদেরই অন্যতম। তিনিই বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ যোগীপুরুষ ও ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার মূর্তপ্রতীক।

যে পনরোই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করিয়া থাকি, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের অমনিই একটি তারিখে দিব্যপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ হুগলী জেলার কোন্নগর গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব কৃষ্ণধন ঘোষ তৎকালের একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন ও তাঁহার মাতৃদেবী স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন তৎকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রাজনারায়ণ বসুর কন্যা।

প্রভাতই দিবসের ভাব-প্রকৃতি বুঝাইয়া দেয়। শ্রীঅরবিন্দের জীবন-প্রভাতেই তাঁহার মেধা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকালে তিনি পড়াশুনার নিমিত্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের সহিত বিলাত গমন করেন ও

সেইখানেই পাশ্চাত্ত্য পরিবেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হন। পাশ্চাত্ত্য পরিবেশে শিক্ষা লাভ করিলেও তিনি তাঁহার ভারতীয় মনকে হারাইয়া ফেলেন নাই। মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু অশ্বারোহণে কিছু ত্রুটির জন্য শেষ অবধি আই. সি. এস. অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হন নাই। একুশ বৎসর বয়সে ভারতের দুলাল শ্রীঅরবিন্দ বিলাত হইতে ভারত মাতার পবিত্র অঙ্কে ফিরিয়া আসিলেন।

ভারতবর্ষেই শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি দেশীয় রাজ্য বরোদার কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার কর্মজীবন শুরু করিলেন। ঐ সময়েই তাঁহার সহিত ভারতের মহাননেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের বন্ধুত্ব হয়।

শ্রীঅরবিন্দ ভারত-আত্মার মূর্তপ্রতীক। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি ভারতীয়। বিদেশী শিক্ষাও তাঁহার ভারতীয় চরিত্রকে নষ্ট করিতে পারে নাই। কর্মজীবনে যতই তিনি ভারতের বিভিন্ন সমস্যার মুখামুখি হইতে লাগিলেন, ততই পরপদানত ভারতভূমির দাসত্ব বেদনা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। কী উপায়ে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে শৃঙ্খলিতা মাতৃভূমিকে তিনি মুক্ত করিবেন, কী উপায়ে শোষিত জাতিকে তিনি অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন,—এই ভাবনায় ও চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই মানসিকতা বশেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন সারাদেশ কার্জনী দুঃশাসনের প্রতিবাদে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনায় উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়েই তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং 'বন্দে-মাতরম' পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

বিদেশী সরকারকে ভারত-ভূমি হইতে বিতাড়ন ও উচ্ছেদের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া এই সময়ে মুক্তিকামী কতিপয় যুবক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত ইংরাজ সরকার মানিকতলার মুরারিপুকুরে এক গুপ্ত বোমা তৈয়ারীর কারখানা আবিষ্কার করিয়া সেই সূত্রে শ্রীঅরবিন্দকেও সন্ত্রাসবাদী হিসাবে আদালতে অভিযুক্ত করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সুচিন্তিত যুক্তিবলে তিনি হাইকোর্টের বিচারে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রীঅরবিন্দ চিরকালের বিপ্লবী ও মুক্তিযোদ্ধা। ইংরাজের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে, শুধুমাত্র রাজনীতিক মুক্তিলাভেই দেশের বা জাতির কল্যাণ হইবে না—আত্মার মুক্তি প্রয়োজন। হৃদয়হীন শাসকই মাত্র আমাদের পীড়ন করে না, অজ্ঞানতা ও অন্ধতাও আমাদের পীড়ন করে। ফলে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরীতে গমন করিয়া আত্মিক মুক্তির জন্য যোগ সাধনায় রত হন ও ক্রমে সিদ্ধিলাভ করেন। অবশেষে এই পণ্ডিচেরী আশ্রমই নিখিল বিশ্বের মুক্তিগামী জনগণের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই সময়েই তিনি 'আর্য' নামে একটি পত্রিকা ইংরাজীতে প্রকাশ করেন এবং ইংরাজী ও বাংলাভাষায় বিবিধ পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'গীতার ভাষ্য' ও ইংরাজী ভাষায় রচিত পুস্তকাদির মধ্যে 'দি মাদার' ও 'লাইফ ডিভাইন' বিশ্বজগৎকে এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়াছে।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সাধনোচিতধামে মহাপ্রয়াণ করেন।

কবি বলিয়াছেন, 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।' আমরাও তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়া বলি, 'হে মৃত্যুঞ্জয়ী দিব্যপুরুষ, তুমি আমাদের দিব্যপৌরুষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আশীর্বাদ করো।'

অনুশীলনী

১। শ্রীঅরবিন্দের বাল্য ও কর্মজীবনের বর্ণনা দাও।

২। (ক) শ্রীঅরবিন্দ কোথায় শিক্ষালাভ করেন ?

(খ) তিনি কোথায় কর্মজীবন আরম্ভ করেন ?

(গ) শ্রীঅরবিন্দকে কবি কি বলিয়া প্রণতি জানাইয়াছেন ?

৩। 'শ্রীঅরবিন্দ চিরকালের বিপ্লবী ও মুক্তিযোদ্ধা'—উক্তিটি বুঝাইয়া দাও।

৪। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : (ক) 'পাশ্চাত্ত্য পরিবেশে······ফেলেন নাই।'

(খ) 'হৃদয়হীন শাসকই······পীড়ন করে।'

৫। টীকা লিখ : সিভিল সার্ভিস, বালগঙ্গাধর তিলক, দেশবন্ধু, কার্জন।



[কবির জন্ম ঃ ১৮৬১ ; মৃত্যু ঃ ১৯৪১। কবিসার্বভৌম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। অতি শৈশবেই তিনি কবিতা রচনায় ব্রতী হন ও সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর কাল ধরিয়া বাংলা সাহিত্যকে তিনি কাব্য-কবিতায়, নাট্য-নাটিকায়, সঙ্গীতে, উপন্যাসে, গল্পে, কথিকায়, ছড়ায় ও প্রবন্ধে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাব্যকৃতি ঃ সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, মানসী, চিত্রা, সোনার তরী, বলাকা, গীতালি, গীতিমাল্য, গীতাঞ্জলি খেয়া, পূরবী, উৎসর্গ, নৈবেদ্য, পুনশ্চ, মহুয়া, বনবাসী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। নিম্নের কবিতাটিতে মহান নিত্য পুরুষের জয়গান ও তাঁহার নিকট কবির প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে।]

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়॥
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়॥

এস দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এস নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়॥

প্রভাত সূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে—
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক লয় ॥

অনুশীলনী

১। কবি 'প্রার্থনা' কবিতায় কাহার নিকট কি প্রার্থনা জানাইয়াছেন ?

২। 'প্রার্থনা' কবিতার মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখ।

৩। (ক) জ্যোতির্ময় কে ?

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

"——, এসেছ রুদ্রসাজে,
— পথে তোমার — বাজে
—— জ্বালাও চিত্তমাঝে,
— হোক লয় ॥"

৪। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : (ক) 'জীর্ণ আবেশ····· হোক ক্ষয়।'
(খ) 'অরুণ বহ্নি····· হোক্ লয়।'

৫। নিম্নের পংক্তিগুলির অর্থ সহজ ভাষায় লিখ :

(ক) 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়'

(খ) 'নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—'

(গ) 'দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে—'

৬। অর্থ লিখিয়া বাক্য রচনা কর :

জ্যোতির্ময়, তিমিরবিদার, অভ্যুদয়, নবীন, আবেশ, দুঃসহ, তূর্য, অরুণ-বহ্নি।

———



যুধিষ্ঠির ও বকরূপী ধর্ম সংবাদ



কাশীরাম দাস

[মহাকবি কাশীরাম দাস জাতীয় মহাকাব্য সংস্কৃত মহাভারতের কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। কাশীদাসী মহাভারত বাঙ্গালীর আদরের ও শ্রদ্ধার বস্তু। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। বর্ধমান জেলার সিঙ্গিগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশে বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরের ধর্মপ্রাণতা পরীক্ষার জন্য জীবন যাপনের জন্য একান্ত আবশ্যিক চারটি মূল প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠির সেই চারিটি প্রশ্নের যে উত্তর দান করেন, তাহাই কবিতাটিতে বলা হইয়াছে।]

কিবা বার্তা, কি আশ্চর্য, পথ বলি কারে।
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

*　　*　　*

ঘটন কারণ হ'ল মাস-ঋতু হাতা।
রাত্রি-দিবা কাষ্ঠ তাহে, পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার-কটাহে কাল কর্তা।
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্তা॥

প্রতিদিন জীব-জন্তু যায় যম-ঘরে।
শেষে থাকে যারা তারা ইহা মনে করে॥
আমরা ত চিরজীবী, নাহি হব ক্ষয়।
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য কহ মহাশয়॥

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা-মুনি নানা মত কয় ॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্মতত্ত্ব-নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য, যাহে যায় মহাজন ॥

অপ্রবাসে ঋণ বিনা যার কাল যায়।
যত্মপি মধ্যাহ্নকালে শাক-অন্ন খায় ॥
তথাপি সেজন সুখী সংসার ভিতর।
বারিচর, শুন চারি প্রশ্নের উত্তর ॥ [মহাভারতের অংশবিশেষ]

অনুশীলনী

১। (ক) কবিতাটির লেখক কে?
(খ) তাঁহার রচিত কোন্ মহাকাব্য হইতে এই কাব্যাংশটি লওয়া হইয়াছে?
(গ) আশ্চর্য কি?
(ঘ) সুখী কে?
(ঙ) পথ কি?

২। বকরূপী ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরগুলি নিজের ভাষায় লিখ।

৩। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর: (ক) 'মোহময় সংসার······বার্তা।'
(খ) 'কে জানে নিগূঢ়······মহাজন।'

৪। মহামতি যুধিষ্ঠির আমাদের কোন্ পথ অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন? ঐরূপ বলিবার কারণ কি?

৫। যুধিষ্ঠিরের মতে এই জগতে প্রকৃত সুখী কে?

৬। নিম্নোক্ত পদ সহযোগে পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা কর:
পাবক; সবিতা; কটাহে; চিরজীবী; নিগূঢ়।

———



[কবির জন্ম : ১৮২৪ ; মৃত্যু : ১৮৭৩। আধুনিক বাংলা কাব্যের যুগন্ধর মহাকবি। 'কাব্যকৃতি : 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', 'বীরাঙ্গনাকাব্য' প্রভৃতি। কবিতাটিতে সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর অবস্থান ও শোচনীয় পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে।]

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে। সপ্তরথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি !
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি,
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারিদিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মূরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে !
আঁধারি চৌদিক যথা গ্রাসে চাঁদে,
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অন্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।

অনুশীলনী

১। (ক) কবিতাটির লেখক কে ?

(খ) তাঁহার রচিত একটি বিখ্যাত কাব্যের নাম কর।

২। সপ্তরথী পরিবৃত অভিমন্যুর অবস্থা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।



[কবির জন্ম : ১৮৩৫ ; মৃত্যু : ১৮৯৪। আধুনিক গীতি-কাব্যের পথিকৃৎ। কাব্যকৃতি : 'সারদা মঙ্গল', 'সাধের আসন' প্রভৃতি। অরণ্যের নিস্তব্ধতা ও সৌন্দর্যই কবিতাটিতে বর্ণিত হইয়াছে।]

নিস্তব্ধ গম্ভীর ঘোর নিবিড় গহন,
ঘন পত্র-ঝোপে রুদ্ধ রবির কিরণ ;
বাহু-শাখা প্রসারিয়ে পরস্পরে আলিঙ্গিয়ে
চক্রাকারে ঘেরে আছে বৃক্ষ অগণন ;
দীর্ঘ দীর্ঘ, স্থূলকায়, বল্লরী বর্মিত তায়,
কোটরে কোটরে কত কুলায় শোভন ;
কাহারো নেবেছে জটা এঁকাবেঁকা, কটা কটা
তেড়া চাড়া ঠেক্‌নার খুঁটীর মতন ;
কাহারো শিকড়দল উঠিয়ে ব্যাপেছে তল,
কুঞ্জরের কঙ্কালের পঞ্জর যেমন ;
গাঢ় ঘন ছায়াময়, জনমে বিস্ময় ভয়,
নিরন্তর ঝরঝর পত্রের মতন ;
কভু মৃগ মৃগী ধায়— চকিত হইয়ে চায়,
কভু দূরে শুনা যায় ভীষণ গর্জন !

অনুশীলনী

১। (ক) কবি এই কবিতায় কি বর্ণনা করিতেছেন ?
(খ) রবির কিরণ রুদ্ধ কেন ?
২। 'অরণ্য-শ্রী' কবিতা অবলম্বনে অরণ্যের একটি বর্ণনা দাও।
৩। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : 'কাহারো শিকড়···পঞ্জর যেমন।'



নবীনচন্দ্র সেন

ব্যাসাশ্রম

[কবির জন্ম : ১৮৪৭ ; মৃত্যু : ১৯০৯। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'ত্রয়ী মহাকাব্যে'র ('রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস') রচয়িতা। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের আশ্রম প্রাঙ্গণের মাধুর্য ও ভূমিকা এই কবিতায় আলোচিত হইয়াছে।

ভারতের পুণ্যাশ্রম, মহাতীর্থ সব !
ঝড়পূর্ণ জগতের শান্তির নিবাস !
সংসার-সমুদ্রে তীর ! আকাঙ্ক্ষা-লহরী—
অনন্ত অসংখ্য,—নাহি প্রবেশে হেথায়।
নাহি ফলে হেথা কভু সুখ দুঃখ ফল
বিষয়-বাসনা বৃক্ষে ; নাহি ফুটে ফুল
পাপের কণ্টক বৃন্তে চিত্ত মুগ্ধকর।
নাহি হেথা সুখে দুঃখ, শান্তিতে বিষাদ,
প্রেমেতে স্বার্থের ছায়া, দারিদ্র্যে দাহন।......
ভারত সমাজদেহ ; আশ্রম নিচয়
তাহার হৃদয়যন্ত্র ; মস্তক তাহার
মহর্ষি ব্যাসের এই পবিত্র আশ্রম। [সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

১। 'ব্যাসাশ্রম'কে শান্তির নিবাস বলিবার কারণ কি ?—উহার বর্ণনা দাও।

২। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর :

(ক) 'ভারতের পুণ্যাশ্রম..... শান্তির নিবাস।'

(খ) 'নাহি হেথা......দারিদ্র্যে দাহন।'



মন্তব্য

অক্ষয়কুমার বড়াল

[কবির জন্ম : ১৮৬০ ; মৃত্যু : ১৯১৯। রোমান্টিক কবি। কাব্যকৃতি : 'প্রদীপ', 'এষা', 'কনকাঞ্জলি', 'শঙ্খ'। কবিতাটিতে জগৎজীবন ও ঈশ্বর সম্পর্কে নানা অভিমত তুলিয়া ধরা হইয়াছে।]

দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাইক বিধাতা ;
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে'।
সুখী বলে,—'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায় ?
ধরণী নরের পদতলে।'
জ্ঞানী বলে,—'কার্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয় ;
এ জীবন প্রতীক্ষাকাতর।'
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর।'
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান।'
কবি বলে,—'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময়, হও হে সদয়!'

অনুশীলনী

১। কবিতাটিতে কাহার উক্তি তোমার নিকট সত্য বলিয়া মনে হয় ?
২। 'মন্তব্য' কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।
৩। 'সুখী' ও 'দুঃখীর' ধারণা নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।
৪। জ্ঞানীর উক্তিটির উল্লেখ করিয়া সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দাও।
৫। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : (ক) 'ভক্ত বলে,……রসিক শেখর।'



স্বদেশ দীক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবিতাটিতে অন্ধ পরানুকরণকে বর্জন করিয়া স্বদেশীর ভাব-চিন্তার মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হইয়াছে ।]

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা—
তব আশ্রমে তোমার চরণে হে ভারত, লব শিক্ষা ।
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন—
যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা ।
নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা ॥

না থাকে প্রাসাদ আছেতো কুটির কল্যাণে সুপবিত্র ।
না থাকে নগর আছে তব বন ফলে ফুলে সুবিচিত্র ।
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে
তোমারে দেখেছি তত ছোটো করে
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়রাজ, তুমি পুরাতন মিত্র ।
হে তাপস, তব পর্ণ কুটির কল্যাণে সুপবিত্র ॥

পরের বাক্যে তব পর হয়ে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ পরেছি পরের সজ্জা ।
কিছু নাহি গণি, কিছু নাহি কহি
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি—

তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থি মজ্জা।
পরের বুঝিতে তোমারে ভুলিতে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।

সে-সকল লাজ তেয়াগিব আজ লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,
তব, মন্ত্রের গভীর মর্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব লইব তোমার দীক্ষা।

অনুশীলনী

১। 'নব বৎসরে কবি কি 'পণ' করিয়াছিলেন? ঐরূপ 'পণ' করিবার কারণ কি?

২। দেশকে দূর ও নিকট হইতে কবি কিভাবে দেখিয়াছিলেন?

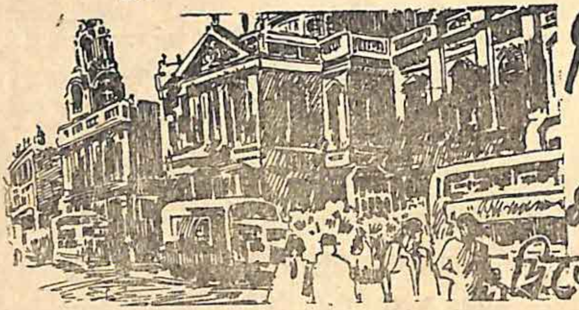
৩। কাহার বাক্যে আমরা 'দেশের' পর হইয়া গিয়াছি? দেশের 'পর' হইয়া আমরা কিরূপ আচরণ করিয়াছি?

৪। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর:

(ক) 'পরের ভূষণ……পরের ভিক্ষা।'
(খ) 'তোমা হতে যত……ছোটো করে।'
(গ) 'তব সনাতন……পেয়েছি লজ্জা।'
(ঘ) 'তোমার ধর্ম……তোমার দীক্ষা।'

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর:

"—— তব পর হায় দিয়েছি পেয়েছি ——।
তোমারে —— ফিরায়েছি মুখ পরেছি পরের ——।
কিছু নাহি ——, কিছু নাহি ——
—— অন্তরে রহি
তব সনাতন —— আসন মোদেরি ——।
পরের —— তোমারে ভুলিতে দিয়েছি পেয়েছি ——।"



বিলেত দেশটা মাটির

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[কবির জন্ম : ১৮৬৩, মৃত্যু : ১৯১৩। প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার। কাব্যকৃতি : মন্দ্র, আলেখ্য, আষাঢ়ে, ত্রিবেণী প্রভৃতি। কবিতাটিতে কবির সমকালে বিলাতের সম্পর্কে কিছু কিছু লোকের মনে যে মোহ ছিল, তাহা কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের ভঙ্গীতে অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন।]

বিলেত দেশটা মাটির ;
সেটা সোনার রূপোর নয় ;
তার আকাশেতে সূর্য উঠে,
মেঘে বৃষ্টি হয় ;
তার পাহাড়গুলো পাথরের,
আর গাছেতে ফুল ফোটে ;—
—তোমরা বোধহয় বিশ্বাস এটা
কর্চ্ছ নাক' মোটে ;
কিন্তু এসব সত্যি, এসব সত্যি,
এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
তোমরাও বলতে তাই।

সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ,
আর ঐ মেয়েগুলো সব মেয়ে ;
আর জোয়ান বুড়ো কচি,
কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে ;

তাদের মাথাগুলো সব উপর দিকে,
পাগুলো সব নীচে ;
—তোমরা মুচ্‌কি হাসচ বোধহয়
ভাবচ এ সব মিছে ;
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি,
সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
তোমরাও বলতে তাই।

তবে কিনা, দেশটা বিলেত,
এবং জাতটা বিলিতি ;
কাজেই—একটু সাহেবী রকম
তাদের রীতি নীতি।
আর ঐ করে শুধু সাদা হাতে
চুরি ডাকাতি সে ;
আর স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে
বিশুদ্ধ ইংলিশে,
এই তফাৎ, এই তফাৎ,
এই তফাৎ মাত্র ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাদের
বিশেষ তফাৎ নাই।

অনুশীলনী

১। কোন্ কোন্ দিক হইতে বিলাতের সহিত আমাদের মিল ও অমিল কবি নির্দেশ করিয়াছেন ?

২। (ক) সাদা হাতে সাহেবরা কি করেন ?
(খ) সাহেবেরা কোন্ ভাষায় ঝগড়া করে ?

৩। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ
(ক) 'সেথা পুরুষগুলো……হাওয়া খেয়ে।'



[কবির জন্ম : ১৮৬৩ ; মৃত্যু : ১৯৪৩ । প্রসিদ্ধ মহিলা-কবি । কাব্যকৃতি : 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি' প্রভৃতি । 'পাপ ঘৃণ্য, কিন্তু পাপী করুণার পাত্র ।'—এই মহতী চিন্তাবশেই পাপীর প্রতি আমরা যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করি, তাহা স্মরণ করাইয়া এই কবিতায় আত্মসমালোচনা করা হইয়াছে ।]

যে ডোবে, সে ডুবে যায়, আমাদের ঘরে—
কখনো সে পায় না আশ্রয়,
আমাদের ঘরবাড়ী আমাদেরি তার,
যে পড়ে তাহার ঠাঁই নয় !
অনুতাপে যদি তার হৃদয় ভাঙিবে
তবু মোরা দূরেই রহিব,
অভাগা সে যদি কভু উঠিতে চাহিবে
ছি ! ছি ! তার হাত না ধরিব ।

সুখের সাধক মোরা—আত্মসুখ দাস,
সে পতিত পথের কাঙালী—
তার তরে নাই ক্ষমা করুণা আশ্বাস,
আছে শুধু পদাঘাত, গালি !

এই আমাদের নীতি—চিরদিন সবে
পতিতেরে পায়ে দ'লে যাই,
আমাদের কত পাপ—সীমা নাহি হবে,
তার পানে কভু নাহি চাই।

অনুশীলনী

১। পাপীর প্রতি আমরা কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি ?

২। পাপীর সহিত আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ?

৩। (ক) পাপী আমাদের ঘরে আশ্রয় পায় কি ?
(খ) পাপী অনুতপ্ত হইলে আমাদের সাহায্য পায় কি ?
(গ) পাপীকে দয়া না করিলে আমাদের পাপ হয় কি ?

৪। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ
(ক) 'সুখের সাধক মোরা আত্মসুখ দাস'
(খ) 'আমাদের কত······নাহি চাই।'

৫। 'পাপ' কবিতায় কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

"এই আমাদের——চিরদিন সবে
——পায়ে দলে যাই,
আমাদের কত——সীমা নাহি হবে,
——পানে——নাহি চাই।"

৭। বাক্য রচনা কর ঃ
ঠাঁই, অনুতাপ, সাধক, পতিত, আশ্বাস।



[কবির জন্ম, ১৮৬৪ ঃ মৃত্যু, ১৯৩৩। সুপ্রসিদ্ধ মহিলা-কবি। কাব্যকৃতি ঃ 'আলো ও ছায়া', 'নির্মাল্য' প্রভৃতি। কবিতাটিতে মা ও ছেলের পারস্পরিক ভালবাসার মধুর চিত্র অপূর্ব ভাষায় চিত্রিত।]

জড়ায়ে মায়ের গলা শিশু কহে আসি,—
"মা, তোমারে কত ভালবাসি!"
"কত ভালবাস ধন ?"—জননী সুধায়।
"এ—ত।" বলি দুই হাত প্রসারি' দেখায়।
"তুমি মা আমারে ভালবাস কতখানি ?"
মা বলেন, "মাপ তার আমি নাহি জানি।"
"তবু কতখানি, বল।"
"যতখানি ধরে
তোমার মায়ের বুকে।"
"নহে তার পরে ?"
"তার বাড়া ভালবাসা পারি না বাসিতে।"
"আমি পারি।" বলে শিশু হাসিতে হাসিতে!

অনুশীলনী

১। 'কত ভালবাসি' কবিতায় যে স্নেহমধুর চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা নিজের ভাষায় অঙ্কন কর।

২। 'কত ভালবাসি' কবিতা অবলম্বনে মাতা ও পুত্রের কথোপকথন নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ 'তার বাড়া ভালবাসা......হাসিতে হাসিতে।'



[কবির জন্ম, ১৮৭৮ ; মৃত্যু, ১৯৪৮। পল্লী ও গার্হস্থ্য জীবনের কবি। কাব্যকৃতি : 'রেখা', 'লেখা', 'কাব্য-মালঞ্চ' প্রভৃতি। কবিতাটিতে দিদি-হারা এক অবোধ শিশুর গভীর মর্মবেদনা অপূর্ব ভাষায় রূপ লাভ করিয়াছে। সন্তানহারা মায়ের মূক-বেদনার রঙে ও অবোধ শিশুর অবুঝ ব্যথাভরে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত পল্লী প্রকৃতিও যেন গভীর বেদনায় নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।]

বাঁশ-বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক্ বলা কাজ্‌লা দিদি কই ?
পুকুর ধারে লেবুর তলে,
থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই,
মাগো আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই ?

সেদিন হতে কেন মা আর দিদিরে না ডাকো ;
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?
খাবার খেতে আমি যখন
দিদি বলে ডাকি তখন,
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো ?
আমি ডাকি, তুমি কেন চুপটি করে থাকো ?

বল্ মা দিদি কোথায় গেছে, আস্‌বে আবার কবে ?
কাল্ যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে !

দিদির মত ফাঁকি দিয়ে
আমিও যদি লুকাই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন ক'রে রবে?
আমিও নাই—দিদিও নাই—কেমন মজা হবে!

ভুঁই-চাঁপাতে ভরে গেছে শিউলী গাছের তল,
মাড়াস্ নে মা পুকুর থেকে আন্‌বি যখন জল।
ডালিম গাছের ফাঁকে ফাঁকে
বুল্‌বুলিটা লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে তুমি দিও না মা ছিঁড়তে গিয়ে ফল,
দিদি যখন শুন্‌বে এসে বল্‌বি কি মা বল্।

বাঁশ-বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
এমন সময় মাগো আমার কাজ্‌লা দিদি কই?
লেবুর তলে পুকুর পাড়ে
ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, তাইতে জেগে রই,—
রাত্রি হোল মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই?

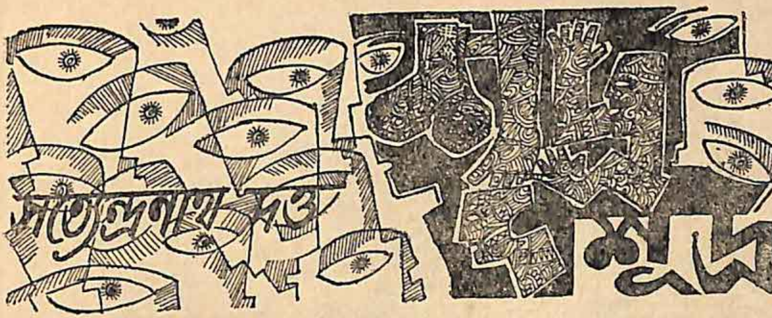
অনুশীলনী

১। 'কাজলা দিদি' কবিতায় শিশুটির ও তাহার মায়ের যে মনোভাব ধরা পড়িয়াছে, তাহা নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

২। 'কাজলা দিদি' কবিতায় শিশু কি কারণে তাহার জননীকে কি কি প্রশ্ন করিয়াছিল?

৩। (ক) কাজ্‌লা দিদির কি হইয়াছিল?
(খ) শিশুর ঘুম আসে না কেন?

৪। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর: (ক) 'আমিও নাই……মজা হবে।'
(খ) 'রাত্রি হোল……কাজ্‌লা দিদি কই?'

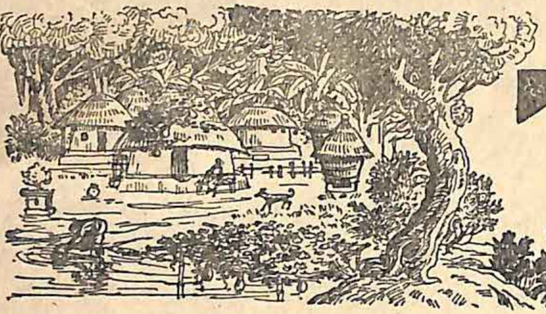


[কবির জন্ম, ১৮৮২ : মৃত্যু ১৯২২। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও ছন্দের জাদুকর। কাব্যকৃতি : 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবির', 'বিদায়-আরতি', 'তীর্থ-সলিল' প্রভৃতি। শূদ্রের প্রতি বর্ণাশ্রমবাদী উচ্চবর্ণেরা যুগে যুগে যে অবহেলা ও ঘৃণা দেখাইয়া আসিয়াছে, এই কবিতাটি তাহার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।]

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো!
শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।
আদি দেবতার চরণের ধূলি
শূদ্র,—এ কথা শাস্ত্রে কহে,
আদি দেবতার পদরেণু-কণা
সকল দেবতা মাথায় বহে।
বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
না করিবে শিরোধার্য কেবা?
কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—
শূদ্রে বলেরে করিতে সেবা?
গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন
পরশ তাহার পুণ্য সাথী।
শূদ্র শোধন করিছে ভুবন
তাই তার ঠাঁই শ্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না ভুলে।
শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে;
মহামানবের গতি সে মূর্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে!

অনুশীলনী

১। 'শূদ্র কাহাকে বলে? 'শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে!'—কথাটি বুঝাইয়া দাও।
২। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : (ক) 'আদি দেবতার......মাথায় বহে।'
(খ) 'শুদ্ধ-সত্ত্ব......ক্ষুদ্র নহে।'



পল্লীরাণী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[কবির জন্ম, ১৮৮৩, মৃত্যু ১৯৭০। পল্লীপ্রীতি ও ভক্তিরসের রসিক-কবি। কাব্যকৃতি : 'নূপুর', 'শতদল', 'অজয়', 'বনতুলসী' প্রভৃতি। গ্রামীণ বাংলার অপূর্ব রূপশ্রী কবিতাটিতে চিত্রিত।]

জড়ানো শ্যাম শ্যাম-লতাতে নদীতীরের গুল্মগুলি,
স্বচ্ছ তরল মুকুর পানে হর্ষে চেয়ে উঠ্‌ছে তুলি ;
ওই যেথা ওই শশক চরে, শঙ্কাবিহীন হৃষ্টমনে,
মিশ্‌ছে নদীর কলধ্বনি মৌমাছিদের গুঞ্জরণে,
ঝরা পাতার আসন পাতা, গাছটি ভরা মল্লিকাতে,
আসছে ভেসে ফুলের পরাগ শীতল শীকর-সিক্ত বাতে,
প্রকৃতির ওই নম্র গৃহে, শোভার প্রমোদ-ভবন মাঝে
মোদের রাণীর মৌন মুখর মধুর বীণা নিত্য বাজে !...

অতীত দিনের ক্ষুদ্র কথা, দুঃখ সুখ ও কান্নাহাসি,
মোদের রাণীর মৌন মুখের বীণার স্বরে উঠ্‌ছে ভাসি' !
ঠেলে রেখে কাজের বোঝা, বন্ধ করে বইয়ের পাতা
মায়ের বিজন মন্দিরেতে, এসো তোমায় ডাকছি ভ্রাতা !
আজকে শ্যামল মাঠ যে আলো বেগুনী ওই 'মস্‌নে-ফুলে',
মোটা ঝিঙার সতেজ লতা পড়ছে ঝুলে নদীর কূলে ;

বেগুন-ক্ষেতের কুটির হ'তে মিঠা মেঠো আস্‌ছে গীতি,
নূতন আমের মঞ্জরীতে আন্‌ছে টেনে সুদূর স্মৃতি !
পল্লীরাণীর শান্ত গৃহে পল্লীরাণীর স্নিগ্ধ ছবি—
দেখ্‌তে সবায় ডাক্‌ছি আমি—এস ভাবুক—ভক্ত—কবি।

অনুশীলনী

১। 'পল্লীরাণী' কবিতা অনুযায়ী পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনা দাও।

২। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) 'প্রকৃতির ওই……বীণা নিত্য বাজে !'

(খ) 'অতীত দিনের ·· উঠ্‌ছে ভাসি !'

(গ) 'পল্লীরাণীর শান্ত গৃহে…· ভক্ত কবি।'

৩। তোমার দেখা কোন একটি গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিজের ভাষায় লিখিবার চেষ্টা কর।

৪। কবি কাহাদের, কি কারণে, কোথায়, আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন ?

৫। অর্থ লিখিয়া নিম্নোক্ত পদগুলির দ্বারা বাক্য রচনা কর ঃ
স্বচ্ছ, মুকুর, শঙ্কাবিহীন, গুঞ্জরণ, শীকর, মঞ্জরী।



মায়ের প্রতিমা

মোহিতলাল মজুমদার

[কবির জন্ম, ১৮৮৮ ; মৃত্যু, ১৯৫২। প্রসিদ্ধ কবি ও প্রতিভাবান সমালোচক। কাব্যকৃতি : 'রূপকথা', 'বিস্মরণী', 'স্মর-গরল' প্রভৃতি। দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণকালে একটি বালকের অকপট সহজ সরল চিন্তা এই কবিতার উপজীব্য।]

ঝক্‌ঝকে নীলাকাশ সোনাঢালা রোদ্দুর,
ভোর হ'তে 'কাঁই নানা' আর সানায়ের সুর।
আজ পূজো সত্যিরে! এবারে যে ভাল আছি,
আর বার জ্বরে পড়ি ঠিক পূজো কাছাকাছি।
একেবারে আসে না ত' মা যে বড় দেরি করে।
সিঁদুরের দাগ বাঁশে, তারও কত দিন পরে।
সিঙ্গিটা ঠিক হ'তে কতদিন লাগে ভাই?
পাল কাকা কেন এত দেরি করে ভাবি তাই।
চশ্‌মাটি চোখে দিয়ে সেই চোখ ভুরু-টানা
কতবার স'রে এসে দেখে মার মুখখানা।
যত ভাবি আর কেন? তত দেখি আরো আছে!
শেষকালে চিনি ঠিক মা-তো এই আসিয়াছে।
প্রতিবার মন থেকে ঠিক গড়ে ছবিখানি।
পুরুতের চেয়ে আমি তাই তারে বড় মানি।

পরশু ত দিন ভ'র চিত্তির হ'ল চাল,
আঁচলা ও মটুকেতে সাজাইল মালী কা'ল।
আর মোটে তিনদিন তারপর সব শেষ,
পূজো মানে শেষ করা, তার চেয়ে গড়া বেশ।
চট্ ক'রে গ'ড়ে যদি রেখে দেয় তিন মাস।
প্রাণ ভ'রে দেখে নিই তবে বুঝি মেটে আশ।

আগে মার মুখ দেখে ভ'রে যায় অন্তর,
তারপর পূজোপাট যত কিছু মন্তর।

অনুশীলনী

১। মায়ের প্রতিমা নির্মাণকালে বালক-কবির যে মনোভাব জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) 'পুরুতের চেয়ে আমি……বড় মানি।'

(খ) 'পূজো মানে শেষ করা……গড়া বেশ।'

(গ) 'আগে মার……যত কিছু মন্তর।'

৩। দুর্গাপ্রতিমা দেখিয়া তোমার যেরূপ মনে হয়, তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৪। বাক্য রচনা কর ঃ

ঝক্‌ঝকে, রোদ্দুরে, সিঙ্গি, পুরুত, চিত্তির, আঁচলা, পূজোপাট।

ঈশ্বর

কাজী নজরুল ইসলাম

[কবির জন্ম, ১৮৯৯। সুবিখ্যাত বিদ্রোহী কবি। কাব্যকৃতি : 'অগ্নিবীণা', 'বিশের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' প্রভৃতি। কবিতাটিতে ঈশ্বর যে সর্বময় ও তাঁহাকে যে আপনার সত্য-জিজ্ঞাসার মধ্যেই পাওয়া যায়—ইহাই বলা হইয়াছে।]

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে'
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে ?

হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মাণিকে বুকে ধরে' তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,
স্রষ্টারে খোঁজো—আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে ;
ইচ্ছা-অন্ধ ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ-কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠো না, শাস্ত্রবিদেরে করো নাক' বীর, ভয়—
তাহারা খোদার খোদ্ "প্রাইভেট সেক্রেটারী" ত নয় !
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি !
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি !
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক্ সিন্ধু-কূলে—
রত্নাকরের খবর তা বলে' পুছো না ওদেরে ভুলে'।

উহারা রত্ন বেণে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে !

ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু জলে !

অনুশীলনী

১। 'ঈশ্বর' কবিতার মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। 'ইচ্ছা-অন্ধ' বলিবার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৩। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর :

(ক) 'সৃষ্টি রয়েছে……ফিরিছ খুঁজে'।

(খ) 'ইচ্ছা অন্ধ……তাঁহার ছায়া।'

(গ) 'সকলের মাঝে……জন্মদাতারে চিনি।'

(ঘ) 'শাস্ত্র না ঘেঁটে……সত্য-সিন্ধুজলে।'

৪। টীকা লিখ : দরবেশ, প্রাইভেট সেক্রেটারী।

৫। অর্থ লিখিয়া বাক্য রচনা কর :
জগদীশ, ঋষি, স্রষ্টা, দর্পণ, অবয়ব, রত্নাকর, সত্য-সিন্ধু।



[কবিব জন্ম, ১৯০৩। সুপ্রসিদ্ধ পল্লীকবি। কাব্যকৃতি: 'নকশী কাঁথার মাঠ', 'বালুচর' প্রভৃতি। কবিতাটিতে একটি বালুচরের নিসর্গশোভা ও তাহার গ্রামীণ রূপই বর্ণিত হইয়াছে।]

উড়ানির চর ধূলায় ধূসর যোজন জুড়ি,
জলের উপর ভাসিছে ধবল বালুর পুরি।
ঝাঁকে ব'সে পাখি ঝাঁকে উড়ে যায়
শিথিল শেফালি উড়াইয়া বায়
কিসের মায়ার বাতাসের গায় পালক পাতি ;
মহা কলতানে বালুয়ার গায়ে বেড়ায় মাতি।

উড়ানির চর কৃষাণ-বধূর খড়ের ঘর,
ঢাকাই সীমের উড়িছে আঁচল মাথার 'পর
জাঙ্‌লা ভরিয়া লাউয়ের লতায়
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দোলায়
ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায় নাচিছে ঘুরি
'উড়ানি চরে'র বুকের আঁচল কৃষাণ-পুরী।

উড়ানির চর উড়ে যেতে চায় হাওয়ার টানে,
চারিধারে জল করে ছলছল কী মায়া জানে।
ফাগুনের রোদ উড়াইয়া ধূলি,
বুকের বসন নিতে চায় খুলি
পদতলে জল কলগান তুলি নূপুর নাড়ে ;
উড়ানির চর চিক্‌চিক্ করে বালুর পাড়ে !

অনুশীলনী

১। 'উড়ানির চর' কবিতা অনুযায়ী সেই বালুচরের সৌন্দর্য বর্ণনা কর।

২। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর :

(ক) 'কিসের মায়ায়······বেড়ায় মাতি।'

(খ) 'উড়ানির চর····· মাথার 'পর।'

(গ) 'জাঙ্‌লা ভরিয়া······কৃষাণপুরী।'

(ঘ) 'উড়ানির চর উড়ে····· কী মায়া জানে।'

৩। অর্থ লিখিয়া বাক্য রচনা কর :

ধূসর, যোজন, ধবল, শিথিল, কলগান।



[কবির জন্ম : ১৯০৪। আধুনিক কবি। কাব্যকৃতি : 'প্রথমা', 'সম্রাট', 'ফেরারী ফৌজ' প্রভৃতি। কবিতাটিতে ছড়ার ঢং-এ একটি রূপকল্প তুলিয়া ধরা হইয়াছে।]

এ-পারেতে কালো রং বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্
ও-পারেতে গাছে শুধু লঙ্কা টুক্‌টুক্ করে,
কালা ধলা ভাই আমার মন কেমন করে!
মাঠে নেই পাকা ধান মই দেবো কি?
কাস্তে কোদাল থাকে আনো শান দিয়ে দি।
মুগুর হাতুড়ি দাও কাঁটা ঠুকে নেবো
হাসিমুখে ঠোঁট-রাঙা পান খেতে দেবো।
নদীতে কোটালে বান, ডিঙি ভেঙে খান্ খান্
এ-বারেতে যাদুমণি কেমন করে যাই
আবার জোয়ার এলে হবে না কামাই।
ঘরে আছে খুদ কুঁড়ো
তাতে দিও নুনের গুঁড়ো,
লঙ্কা দুটো ছিঁড়ে, তাই চাঁদ মুখে খাও—
বাদল গেলে দেব তোমায়, পুলি-পোলাও।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির কথাবস্তু নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।
২। তোমার জানা কোন একটি 'ছড়া' আবৃত্তি কর।
৩। বাক্য রচনা কর : ঝম্‌ঝম্, টুক্‌টুক্, ঠোঁটরাঙা, খান্ খান্।



টুটুর জন্য

বুদ্ধদেব বসু

[কবির জন্ম, ১৯০৮ ; মৃত্যু, ১৯৭৪ । সুবিখ্যাত আধুনিক কবি। কাব্যকৃতি : 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী', 'দময়ন্তী' প্রভৃতি। এই কবিতায় 'টুটু' নামে এক বালকের জবানীতে কবি সৌন্দর্যের উপাসনা-ই যে বিদ্যার উপাসনা, তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ সুন্দর, সত্য ও সরস্বতী অভিন্ন।]

বলতে পার সরস্বতীর মস্ত কেন সম্মান ?
বিদ্যে যদি বল তবে গণেশ কিছু কম যান ?

সরস্বতী কি করেছেন। মহাভারত লেখেন নি।
ভাব দেখে তো হচ্ছে মনে তর্ক করাও শেখেন নি।

তিন ভুবনে গণেশ-দাদার নেই জুড়ি পাণ্ডিত্যে,
অথচ তাঁর বোনের দিকই ভক্তি কেন চিত্তে ?

সমস্ত রাত ভেবে ভেবে এই পেয়েছি উত্তর—
বিদ্যা যাকে বলি তারই আর একটি নাম সুন্দর।

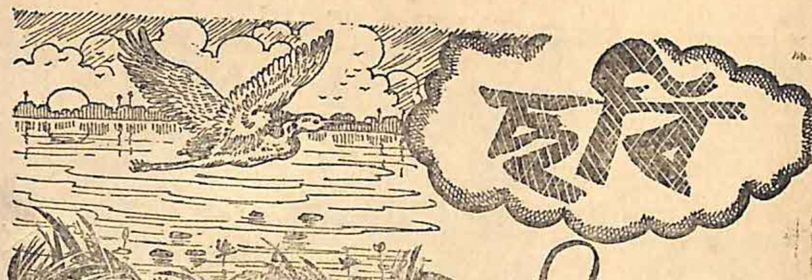
অনুশীলনী

১। 'টুটু' সরস্বতীর সহিত গণেশের কিভাবে তুলনা করিয়াছিল ?

২। সমস্ত রাত চিন্তা করিয়া 'টুটু' তাহার কোন্ প্রশ্নের কি উত্তর খুঁজিয়া পাইয়াছিল ?

৩। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : 'বিদ্যা যাকে……নাম সুন্দর।'

———



ছবি

বিমল ঘোষ

[কবির জন্ম, ১৯১০। প্রখ্যাত আধুনিক কবি। কাব্যকৃতি : 'উদাত্ত ভারত'। কবিতাটিতে অপরাহ্ণ ও সায়ংকালের একটি নিসর্গ চিত্র অপরূপ ছন্দ ও ভাষায় স্বচ্ছন্দভাবে চিত্রিত হইয়াছে।]

নিঝুম রোদ ঝিমোয় মাঠ চুপ করে।
দিঘির পাড় কী নিঃসাড় বসল বক ঝুপ্ করে॥
মাথায় নীল আকাশ তার তুলির টান দিগন্ত।
পশ্চিমের সূর্য ম্লান দিনের ঝাঁজ নিভন্ত।
ক্লান্তি নাই শান্ত বক দাঁড়িয়ে ঠায় এক পায়ে।
শুনছে কার বাঁশির সুর বাজছে কোন্ দূর গাঁয়ে॥
লাল শালুর পাপড়িতে বাতাস দেয় হালকা দোল।
কাঁপছে ঢেউ তাকায় বক মৌমাছির মন বিভোল॥

সূর্য যেই ডুবল বক উড়ল লাল মেঘ দেখে।
হাজার বক ফুল ফোটায় শূন্যে তার পথ এঁকে॥

অনুশীলনী

১। 'ছবি' কবিতায় কবি যে নিসর্গ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : 'হাজার বক......পথ এঁকে।'

৩। সন্ধ্যাকালে তুমি যে ভাবে প্রকৃতিকে দেখিয়া থাক, তাহা নিজের ভাষায় লিখিবার চেষ্টা কর।



[কবির জন্ম, ১৯২০। বিশিষ্ট আধুনিক কবি। কাব্যকৃতিঃ 'পদাতিক', 'চিত্রকূট' প্রভৃতি। কবিতাটিতে উভয় বাংলার সংস্কৃতি ও চিন্তার অখণ্ড রূপটি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।]

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দু'টি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—
থাকুক গে পাহারা।

দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা।

ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা ॥

অনুশীলনী

১। 'আমরা' বলিতে 'পারাপার' কবিতায় কবি কাহাদের নির্দেশ করিয়াছেন? তাহাদের 'চোখের দু'টি তারা' বলিবার কারণ কি?

২। 'দুয়োরে খিল।' কোন্ দুয়ার?—কথাটির সহজ অর্থ কি?

৩। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করঃ 'ওপারে যে···সেই বাংলা।'

৪। কবিতাটির মধ্য দিয়া কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

———



[কবির জন্ম, ১৯২৬ ; মৃত্যু, ১৯৪৭। বলিষ্ঠ বিপ্লবী কবি। কাব্যকৃতি : 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'মিঠেকড়া' প্রভৃতি। কবিতাটিতে অসম সমাজ ব্যবস্থার প্রশ্নটি তুলিয়া ধরা হইয়াছে।]

বলতে পারো বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?
বড় মানুষ ভোজের পরে ফেলে লুচি মিষ্টি,
গরীবরা পায় খোলামকুচি, একী অনাসৃষ্টি ?
বলতে পারো ধনীর বাড়ি তৈরী যারা করছে,
কুঁড়ে ঘরেই তারা কেন মাছির মত মরছে ?
ধনীর মেয়ের দামী পুতুল হরেক রকম খেলনা,
গরীব মেয়ে পায় না আদর, সবার কাছে ফ্যালনা।
বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য ?

'হিং-টিং-ছট্' প্রশ্ন এসব মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরী গরীব লোকের চামড়ায় ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির নাম 'পুরনো ধাঁধা' রাখিবার কারণ কি ?
২। বড়মানুষ ও গরীব মানুষের জীবনযাত্রার ভেদ কবি কিভাবে দেখাইয়াছেন ?
৩। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : 'হিং-টিং-ছট্······চামড়ায় ॥'



[অঝোর ধারা বরষার রূপ-বৈচিত্র্যই কবিতাটিতে অঙ্কন করা হইয়াছে।]

—এক—

রুণু-ঝুনু-ঝুনু নূপুর বাজিছে চরণে,
তৃষিত-ভবনে এসেছে নবীন বরষা ;
মেঘ-কুন্তলে ঢাকিয়া সুনীল নভেরে,
জগত-জীবনে জাগায়েছে নব ভরসা।
বরষা ঝরিছে মেঘের নয়ন ছাপায়ে,
পবনের শিশু পড়িছে ধরাতে ঝাঁপায়ে,
নৃত্য-বিধুরা নাচিছে ধরণী কাঁপায়ে,
কাজল নয়নে কৌতুক হাসি হাসিয়া ;
রুণু-ঝুনু শিলা-নূপুর বাজিছে চরণে,
নয়নের জলে ধরণী যেতেছে ভাসিয়া।

—দুই—

গুরু-গুরু-গুরু ডমরু বাজিছে মেঘেতে,
নাচিছে বালিকা, কিশোরী, যুবতী বরষা ;
বিদ্রূপ-হাসি জ্বলে বিজুরীর রেখাতে,
মাতিছে মরণে জীবন-দায়িনী-হরষা
কালো মেঘ-যানে এসেছে, সে আজ এসেছে,
মেঘের কালিমা নভের নয়ানে মেখেছে,
মন-বাতায়নে বসিয়া জীবন দেখেছে—,

ঋতু-উৎসবে সেজেছে বিপুলা ধরণী ;
কল-ছল-ছল কৌতুক-হাসি হাসিয়া,
হাসিছে, মাতিছে কালা-গুরু-মেঘ-বরণী।

—তিন—

গ্রীষ্মের চিতা বহ্নিতে জ্বলা ধরাতে,
এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বালিকা,
ভস্মেতে মাখা গৈরিক-ধরা-বাসরে,
নাচিছে মত্তা, মেঘ-কুন্তলা কালিকা ;
তৃণ-অঙ্কুরে, নীপ মূলে, নীপ শাখাতে,
প্রাণদ-ধারার প্রাণ-বারি বুঝি মাখাতে,
নূতন জীবনে জাগাতে এ ধরা জাগাতে,
এসেছে নবীনা, কিশোরী বরষা এসেছে,
নৃত্যের তালে জীবন-মৃত্যু জাগায়ে,
নৃত্য-বিধুরা 'ভীম-সুন্দর' হেসেছে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি অবলম্বনে বরষার রূপ-বৈচিত্র্য বর্ণনা কর।
২। তোমার দেখা কোনও বর্ষণ-স্নাত দিনের বর্ণনা দাও।
৩। স-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর : (ক) 'গ্রীষ্মের চিতা......কালিকা।'
(খ) 'তৃণ-অঙ্কুরে..... এসেছে।'

Presented
with best Compliments